।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

সময়ের যন্ত্রণা --- সে তো অসময়

('অসময়'—'মোহ'—'কালের নায়ক'—

'নিরন্ত্র'—'অশেষ'—'নিমফুলের গন্ধ')

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯টি উপন্যাস আলোচিত হয়েছে ; বর্তমান পরিচ্ছেদের আলোচনা গড়ে উঠেছে ৬টি উপন্যাসকে কেন্দ্র করে । প্রশ্ন উঠতে পারে নিরবচ্ছিন্নভাবে সমস্ত উপন্যাসগুলিকে একই পরিচ্ছেদভুক্ত না করে এই পৃথকীকরণের প্রয়োজন কী আবশ্যক ছিল ? কথামুখ অংশে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে । প্রসঙ্গত আবারও জানাই পূর্ববর্তী দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের আলোচনাকালে সেই সব উপন্যাসকে চিহ্নিত করা হয়েছে— যে গুলির মধ্যে অসুখের প্রসঙ্গ এসেছে প্রবলভাবেই । অসুখের প্রসঙ্গ এখানে কেন্দ্রীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । সমস্ত উপন্যাসের গঠনের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । বর্তমান পরিচ্ছেদের মধ্যেও অসুস্থতার নিদর্শন পরিস্ফুট — কিন্তু পূর্ব পর্যায়ের মত প্রবল ভাবে নয় । অসুখের কথা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে , যদিও কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করেনি । উপন্যাসের গঠনে তার স্থান পার্শ্বিক ।

সময়ের গতি সততই চঞ্চল । কখনও তা কুটিল — কখনও আবার নিতান্তই সহজ-সরল । এই মুহূর্তে যা বিক্ষোভ বিহীন , পরক্ষণে তাই-ই হয়তো অশান্ত ঝটিকা । জীবনের পাত্রটিকে কখনও তা কানায় কানায় দেয় ভরিয়ে ; কখনও আবার প্রাণের মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে যায় অন্তহীন বেদনার হাহাকার । সুখের সমৃদ্ধ মুহূর্তে যা হতে পারত অতি আপন , রিক্ততার নৈরাশ্যে অজস্র আকুলতা সত্ত্বেও তাই আবার পরিহারের । এই অস্বীকৃতি , গ্রহণের ব্যর্থতা , — সে তো সময়েরই অসুখ : 'অসময়' (১৩৭১) উপন্যাসের ভিতর সেই ইঙ্গিতই দেওয়া হয়েছে ।

মোহিনী এই উপন্যাসের প্রধান নারী চরিত্র । সব দিক থেকেই অতুলনীয়া সে । যথাসময়ে স্বামীর ঘর করতে গিয়েও পিতৃগৃহে ফিরে আসতে হয়েছে তাকে । ওখানে থাকা সম্ভব ছিল না । ফিরে আসার পর সংসারের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তার উপরেই বর্তেছে ।

সন্দেহ নাই —মোহিনী হাসিমুখে তার কর্তব্য পালন করেছে, কি-তু বুকের মধ্যে শূন্যতার যে আগ্রাসন —তার কবল থেকে রেহাই মিলবে কী করে ? হঠাৎ-ই মোহিনী আবিষ্কার করে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে অবিন নামের এক প্রাণচঞ্চল যুবক, যে একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর এবং সুন্দর। একদা মোহিনীর জীবনে শচিদার মত মানুষটির গুরুত্ব কম ছিল না। স্বল্প দিনের জন্যে দুশ্চরিত্র স্বামীর সঙ্গেও থাকতে হয়েছিল তাকে। কি-তু এই পুরুষটি যে সকলের থেকে আলাদা। সে প্রচলিত সংস্কারবোধকে তাচ্ছিল্যের ঝোড়ো হাওয়ায় উড়িয়ে দেয়, অসঙ্গত ভাবনাকে নির্মম ভাবে বিধ্বস্ত করে। রক্ত-মাংসের আকৃতিকে উপেক্ষা করে মোহিনীকে নিছক মাটির প্রতিমা বলে মেনে নিতেও সায় দেয়নি তার মন। অবিন মোহিনীর সমগ্র সত্তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। এমন মানুষের জন্যে জন্মান্তর অপেক্ষায় থাকা যায়, কি-তু বড় দেরি হয়ে গেছে এখন। এই অসময়ে অবিনকে সে কী দিতে পারে ? —তাই মোহিনীকে বোধহয় ফিরেই যেতে হবে। সংশয় এবং প্রেমে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়েছে মোহিনীকে।

অন্যান্য চরিত্রগুলি সম্পর্কে বলা যায় আয়না ও তপুর অন্তরঙ্গতার মধ্যে যে সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল — শেষ পর্যন্ত তাকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়েছে। সুহাস-বুলার একদা গভীর সম্পর্কের করুণ পরিণতি অবশ্য বিচলিত করেছে পাঠকের অন্তর। শচিপতি মৃত্যুভয়ে সদা সন্ত্রস্ত; ভয়ঙ্কর অসুস্থতার বন্ধন থেকে চরিত্রটি মুক্ত হতে ব্যর্থ হয়েছে। জ্যাঠামশাই অভিজাত মিত্র বংশের প্রবীণতম পুরুষ। চোখের সামনে তাঁকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে একের পর এক ভাঙনের শোচনীয় দৃশ্য। জীব জগতের এই বিবর্ণ রূপ কি-তু এতটুকুও বিভ্রান্ত করতে পারেনি তাঁকে। উপন্যাসভুক্ত অধিকাংশ চরিত্রের মধ্যেই মোহিনীর ভাগ্য-বৈরূপ্য জনিত প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। ব্যক্তি এবং সমাজের চিরাচরিত দুন্দুর পরিচয়ও উপন্যাসে দুর্লভ নয়।

সব দিক থেকে আভিজাত্য আছে—এমন পরিবারেই বেড়ে উঠেছিল মোহিনী। সৌন্দর্যের সঙ্গে গুণের সমন্বয় অতুলনীয়া করে তুলেছিল তাকে। অনেক দেখা-শোনার পর ধুমধামের সঙ্গে তার সেখানে বিয়ে হল —তারও কম বনেদি নয়। স্বামীর নাম রাজেশ্বর। রূপময় স্বামীকে দেখে গর্বই জেগেছিল মোহিনীর মনে। কি-তু মানুষ এক ভাবে — হয় অন্যরকম। মাত্র কিছুদিন পরেই শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে আসতে বাধ্য

হল সে । না এসে উপায় ছিল না । ব্যাভিচারী স্বামীকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব ছিল । মোহিনী জানিয়েছে :

> একটা কথা ঠিকই, আমি যদি চাইতাম
> শ্বশুরবাড়িতে আমার অধিকারটুকু রাখতে
> পারতাম । কি-তু সে অধিকার রেখে লাভ
> কী ? তাতে আমার খাট-পালঙ্ক, ঘর দোর,
> শাড়ি-জামা-অলঙ্কার, ঝি-দাসীর ওপর অধিকারটুকু
> থাকত, তার বেশি কিছু নয় । আমার স্বামীকে
> আমি পেতাম না । সে তার সেজবৌদির কাছে
> নিজেকে ষোলো আনাই বিকিয়ে দিয়েছিল । সমস্ত
> নোংরামির মধ্যেও একটা জিনিস বোধহয় ছিল,
> ওরা পরস্পরকে ভালবাসত । মানুষের এও এক
> বিচিত্র মতিগতি ।

শ্বশুরবাড়ির কোনওকিছুই মোহিনীর পছন্দ হয়নি । সেখানে থাকলে তাকে একদিন না একদিন মরতে হত । মোহিনী যখন কিশোরী —তখনই প্রগাঢ় দুঃখের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল তার । মণিমা —অর্থাৎ জ্যাঠাইমা মারা যাওয়ার পর সারা বাড়িটাই নিথর হয়ে গিয়েছিল । কি-তু শ্বশুরবাড়িতে দুঃখের যে অভিজ্ঞতা — তার চেহারাটাই আলাদা । মোহিনীর মুখ থেকে জানা গেছে :

> শ্বশুরবাড়িতে যে ক'মাস থেকেছি আমার গা
> শুধু রিরি করেছে । ঘৃণা, বিরক্তি আর রোষ ।
> অসহায়ের মত সহ্য করেছি অবস্থাটা, কখনো
> মনে হয়নি : ওই স্বামী আমার । তার সঙ্গে
> আমায় একঘরে থাকতে হয়েছে, একই বিছানায়
> শুতে হয়েছে —এই সব বাধ্যবাধকতা ছাড়া
> আমার সঙ্গে তার কোনো ব-ধন ছিল না ।
> আমার কলঙ্ক সেইটুকু, তার বেশি কিছু নয় ।

নিজের ফেলে যাওয়া জায়গায় আবার ফিরে এসে মোহিনী দুঃসহ কষ্টের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু সংসারের ভাঙন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। জ্যাঠামশাই মারা গিয়েছিলেন আগেই। তারপর মোহিনীর বিবাহিত জীবনের চরম লাঞ্ছনা। বুকে অসুখ নিয়ে কিছুকাল পরেই চলে গেলেন মা। শেষকালে বাবা। বংশের প্রবীণ মানুষ শুধু বেঁচে আছেন জ্যাঠামশাই; কিন্তু আর কতদিন? জ্যাঠামশাই সুহাস আর আয়না,—তাদের সমস্ত ভার এখন মোহিনীর উপর।

উপন্যাসের মধ্যে অবিনের সঙ্গে শচিপতির কথাবার্তার ভিতরে মৃত্যু-ভয়ে ভীত শচিপতির মানসিক অবস্থার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, একই সঙ্গে তাদের সংসারে 'অদ্ভুত এক নিয়তির' যে ভয়ঙ্কর 'খেলা' চলেছে—তার বিবরণও আমরা পেয়েছি।

> শচিপতির বাবার আমল থেকেই সংসার ভেঙে
> যেতে শুরু করে। অদ্ভুত এক নিয়তির খেলা
> চলে এ-বাড়িতে। জলজ্যান্ত মানুষগুলো
> অপঘাতে মরতে শুরু করল। ছোটকাকা মারা
> গেল ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট; মেজকাকা ঝড়-বৃষ্টির
> দিন ফিরছিল সাইকেল করে, আমতলায় দাঁড়িয়ে
> বজ্রাঘাতে মারা গেল। বাবা প্রায় পাগল হয়ে
> গিয়েছিল। ছোটকাকি একদিন আগুনে পুড়ে মরতে
> গেল। প্রাণে বেঁচে গেল কাকি, কিন্তু তার
> মাথার দোষ কাটল না। তাকে দেওয়া হল
> রাঁচিতে। আজও কাকি বেঁচে আছে, তবে কাকির
> কাছে অতীত বলে কিছু নেই, শচিপতি একবার
> শেষ চেষ্টা করেছিল বছর খানেক আগে, কাকি
> তাকে চিনতে বা মনে করতে পারে নি। এখন
> একেবারে জড়বুদ্ধি। বাবা শেষের দিকে আত্মহত্যা
> করল। সংসারে ছেলে বলতে শচিপতি একা,
> মেজকাকার একটি মেয়ে ছিল, বিয়ে-থার পর বাচ্চা

হতে নিয়ে সে মারা যায় । মেজকাকিই অনেকদিন
বেঁচে ছিল ; বছর দুই কাশীবাসী হয়ে কাটিয়ে
সেখানে মারা গেল । শচিপতিই এ-বাড়ির শেষ
জীবিত ব্যক্তি ।

চোখের সামনে একের পর এক এইসব মর্মান্তিক ঘটনা দেখতে হয়েছে বলেই শচিপতির এমন বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থা । মৃত্যু-শোক-যন্ত্রণা তাকে অস্থির করে তুলেছে । অবিনের সঙ্গে শচিপতির কিছু কথা প্রসঙ্গত উল্লেখের দাবি রাখে ,—

আমি বললাম , "আপনি বুঝি মৃত্যু নিয়ে ভাবেন ?"
"ভাবি ।"
"কী ভাবেন ?"
শচিপতি আমার দিকে তাকালেন , দু-পলক
তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন , লণ্ঠনের
আলোয় তাঁর ফ্যাকাসে মুখ আরও নিষ্প্রাণ
দেখাচ্ছিল । সামান্য ইতস্তত করে হেসে
বললেন ,"ভাবি , আমার আশেপাশে কোথায়
যেন একজন ছিপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে , তার
বঁড়শি আমি গিলে ফেলেছি ।"

আতঙ্কগ্রস্ত শচিপতির কাছে পৃথিবীর সমস্ত চাঞ্চল্য –ঘাত-প্রতিঘাতই আপাতত অর্থহীন। অন্য কোনও দিকেই তাঁর দৃষ্টি নাই । প্রতিটি মুহূর্তে উদ্বেগের সঙ্গে তাঁকে ভাবতে হয়েছে —এই বুঝি মৃত্যুর ডাক পৌঁছে গেল ।

অবিন মৃত্যু নিয়ে কোনওদিনই মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাকে পুষে রাখেনি । যা আয়ত্তাধীন নয় , তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কী প্রয়োজন ? তবুও শচিপতির কথাবার্তা-তাঁর মৃত্যুভাবনা অবিনকে খানিকটা অন্যমনস্ক করে দেয় । দু-একটা মৃত্যুর ঘটনা বোধহয় মন থেকে সহজে মুছে ফেলা সম্ভব নয় ; যেমন তার মা পুণ্যবালার মৃত্যু । আফিসের কাজে সরকারি চাকুরে অবিনের বাবাকে প্রায়ই বাইরে ঘুরতে হত । সে-বার মায়ের সঙ্গে অবিনও গিয়েছিল । খুব মনোরম জায়গা,বেশ বেড়ানো যায় ।

একদিন মা একা-একাই বিকেলে নদীর দিকে ঘুরতে গেলেন —কি-তু আর ফিরে এলেন না ।

মা জ্যোৎস্নার মধ্যে একটু দেরী করে ফিরছে ভেবে আমরা বসে আছি । এমন সময় খবর এল , মা নদীতে পড়ে গেছে । গিয়ে দেখি বাঁকের মুখে ঝোপ আর জলো লতাপাতার মধ্যে মা ডুবে আছে । পুরু শ্যাওলার তলায় মার সর্বাঙ্গ ডোবানো । একটা পাথরের ফাঁকে মাথাটুকু মাত্র ভেসে রয়েছে , মুখ একটু পাশ ফেরানো , কপালেই খানিকটা জায়গায় রক্ত জমে কালো হয়ে আছে । কিছু ভিজে চুল মার গলায় , গালে , কপালে আটকে আছে । দৃশ্যটি বড় আশ্চর্যরকম শান্ত , স্তব্ধ ও নিবিড় । অনাবিল জ্যোৎস্না মাথার ওপর , চারপাশ নিঃশব্দ , নির্জন ; রাশি রাশি জোনাকি উড়ছে ঝোপের মধ্যে , আর আমার মা পুরু শ্যাওলার তলায় ডুবে শুয়ে আছে , যেন এতকাল মা যে শয্যায় শুয়ে এসেছে সেটা মার নিজের মনোমতন হয়নি , এই শ্যাওলার শয্যা , জলজ লতাপাতার আবরণ , ঝোপঝাড়ের নির্জনতা , আকাশ থেকে ঝরে পড়া জ্যোৎস্না মার মনোমত হওয়ায় মা অকাতরে ঘুমিয়ে পড়েছে । পাথরের ওপর রাখা মার ছোট মাথাটি এক আশ্চর্য জলপদ্মের মতন ফুটে ছিল ।

ওই মৃত্যু হয়তো নিছক দুর্ঘটনার পরিণাম ; যদিও পরে অবিনের মনে হয়েছে , 'তবু বাইরে থেকে যেটা দুর্ঘটনা ভেতরে তাকালে সেটাই যেন অন্য কোন অর্থ নিয়ে ধরা দেয় ।' আসলে সব কিছু পাওয়া সত্ত্বেও পুণ্যবালার বুকের মধ্যে নিঃসীম শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল । অবিনের ভাবনাতে শূন্যতার প্রসঙ্গটি যে-ভাবে ধরা পড়েছে :

> স্বামী, পুত্র, গৃহ, অলঙ্কার থাকা সত্ত্বেও অনেক মেয়েরই কোথাও একটা শূন্যতা থাকে। সে যেন অতি বাঞ্ছিত কোনো কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। মাঝে মাঝেই এই বিচ্ছিন্নতা এমন করে চেপে ধরে যে, নিজের কোনো অজ্ঞাত বেদনায় তাকে কাঁদতে হয়। আমার মার অন্তত তেমন দুঃখ ছিল।

সকলের মধ্যে থেকেও পুণ্যবালা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। সাংসারিক প্রাপ্তি তাঁর অন্তরের একান্ত চাহিদাকে পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। নিঃসঙ্গ নির্জন তাঁর মনোজগতে দুঃখ ও অ-সুখের মধ্যেই তিনি দিন কাটাতেন। মৃত্যুতেই বোধহয় তাঁর এই অপরিমেয় বেদনার সমাপ্তি ঘটেছে।

কাহিনীর মধ্যে লীলা নামে একটি মেয়ের মৃত্যুর খবর আমরা শুনেছি। সে আত্মহত্যা করেছিল। লীলার এই আত্মহনন সুহাসকে রীতিমতন ভাবিয়ে তুলেছে। আশুদার মুখ থেকে লীলাদের পরিবারের 'ছন্নছাড়া' অবস্থার কথা সে জানতে পেরেছিল। সর্বগ্রাসী বিচ্ছিন্নতার গহ্বর থেকে কারও রেহাই নেই বোধহয়। লীলাও তার শিকার হয়ে গিয়েছিল। পারিবারিক ভাঙন, সম্পর্কগত বিচ্ছিন্নতা এবং মানসিক অবক্ষয়ের বিষাদঘন পরিণতি হিসাবেই যেনলীলার মৃত্যু প্রসঙ্গটি কাহিনীর মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে।

কলকাতায় আয়নার বিয়ের সম্বন্ধ যে-ভাবে ভেঙে গেছে তাতে সুহাস বিস্মিত ও হতাশ। যেহেতু তার দিদি বিয়ের পরেও শ্বশুর বাড়িতে থাকেনি, স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করেছে, সেই কারণে এরকম পাত্রীকে বেছে নেওয়া সম্ভব নয়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এই বিয়ে নাকি অনুমোদনযোগ্য হয়ে উঠবে না। কিন্তু এসবের জন্যে মোহিনীর দোষ কোথায়? একটি সুন্দর সংসারের জন্যে তার মধ্যে তো প্রস্তুতির অভাব ছিল না। যদিও অসহায় হয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়েছিল। নারীত্বকে অস্বীকার করে — স্বামীর ব্যাভিচারকে বিনা আপত্তিতে প্রশ্রয় দিয়ে সে ওখানে টিকে থাকতে চায়নি। অথচ তথাকথিত সামাজিক শুচিতা রক্ষা করবার তাগিদেই

নাকি মোহিনীদের সংস্রব ত্যাগ করতে হবে ; সুতরাং আয়নার বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না । বিচিত্র সমাজের বিচক্ষণতা ! বলিহারি তার কানুন ! সুহাসের মনের মধ্যে প্রতিবাদ জেগে উঠেছে ; কিন্তু একা এই সমাজের অসুস্থ , বিকৃত চিন্তা-ভাবনাকে কী ভাবে পালটে দেওয়া সম্ভব —সে ভেবে উঠতে পারে না ।

উপন্যাসে আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি সুহাস ও বুলার মধ্যে একদা গড়ে ওঠা গভীর-নিবিড় সম্পর্ক পরবর্তীকালে শিথিল হয়ে পড়েছে । বুলা হল সুহাসের বন্ধু মুকুলের বোন । প্রিয় বন্ধুর অ্যাকসিডেন্টে শোচনীয় মৃত্যু সুহাসকে কম যন্ত্রণা দেয়নি । এই মৃত্যু বুলাদের বাড়িতে সকলের কাছে তাকে আরও আপন করে তুলেছিল । বুলা আর সুহাসের ভালবাসা পাপড়ি মেলে দিয়েছিল একটি স্বপ্নের জন্যেই । সুহাস কিন্তু সহসাই সরিয়ে নিল নিজেকে । এক ভয়ঙ্কর ঝড়ে যেহেতু দিদির জীবন একেবারেই এলোমেলো হয়ে গেছে ; সুতরাং তার পক্ষে বুলাকে ঘরে নিয়ে আসা সম্ভব নয় । সুহাসের এই ধরনের সিদ্ধান্তের মধ্যে মোহিনীর জন্যে সহানুভূতি যতই থাক না কেন , —যুক্তির অভাব বিশেষ রূপেই প্রকট । বুলা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে । তার ম্লান সৌন্দর্য , অভিমানাহত অন্তরের আর্তি আমাদের মনকে ব্যথিত করে তোলে । বুলা সুহাসের জন্যে অপেক্ষায় থেকেছে । বুলার কাছ থেকে দূরে সরে থাকার মাধ্যমে সুহাস আত্মত্যাগের যত অভিমানই করুক , আমাদের চিন্তা করতে অসুবিধা ঘটে না —এই পরিবর্তন আকস্মিক এবং আরোপিত ।

জ্যাঠামশাই উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র । স্নেহপ্রবণ এবং আদর্শনিষ্ঠ এই প্রবীণ মানুষটির কষ্টও কিছু কম নয় । শোকের-বেদনার অনেক ঘটনা তাঁর চোখের সামনে ঘটে গেছে , যদিও হাসিমুখেই তিনি সবকিছু মেনে নিয়েছেন —মনকে সান্ত্বনা দিয়েছেন । নিঃসন্তান হয়েও কি-দুযাত্র ক্ষোভ নাই তাঁর মনে । মানু , শোকা , আনু —এরাও তো কম আপন নয় । জ্যাঠামশাই জানিয়েছেন :

> মণিকে একবার আমি বলেছিলাম ; ঠাকুর দেবতার দয়া চেয়ে কেউ কেউ ছেলেপুলে পায় । তুমি কি কোথায় মানত করবে ?
>
> মণি মাথা নেড়ে বলেছিল , না ।

তোমার জন্য আমার যে বড় কষ্ট হয়, মণি ?
আমার কোনো কষ্ট নেই তো। তোমার যদি
কষ্ট থাকে তুমি কষ্ট করে কাঁদতে যাও,
আমায় বাপু কাঁদাতে এস না।

আমার কষ্ট ছিল না, কি-তু নিজের
অক্ষমতার জন্যে লজ্জা ছিল। আমার বাবা
ডাক্তার। আমি পরে শুনেছি, বেশি বয়সে
আমার সাধারণ একটা রোগ হয় —ম্যাম্পস্।
তার হঠাৎ আসা হঠাৎ যাওয়ার মধ্যে শঙ্কার
কোনো কিছু ছিল না; কি-তু ভেতরে ভেতরে
সে কোথায় আমাকে অক্ষম করে গেল তা কেউ জানল
না। মণির সন্তানাদি হল না। সে পরে এটা
শুনেছিল, কি-তু কাঁদতে বসেনি। আমায় বলেছিল :
তুমি মিথ্যে-মিথ্যে মন খারাপ করো না; কত
মানুষের কত কী হয়, কে কত দুঃখ পায়, কত
রোগভোগ সয়। ভগবানের কাছে সব চাইতে নেই,
তিনি যতটুকু দিয়েছেন ততটুকু নিয়ে তৃপ্তি পাবার
চেষ্টা করো। তুমি তো কতকিছু পেয়েছ, নিজের
দুটো ছেলেপুলে না থাকলেই মন খারাপ করতে
হবে। মানু, খোকা —এরাও তো তোমাদের রক্ত।

জ্যাঠামশাই-এর কাছ থেকে আমরা জেনেছি : দৈবের সম্মতি না থাকলে প্রাপ্তিযোগ ঘটে না; কি-তু গ্রহণের মধ্যেই মানুষ তার হৃদয়কে প্রসারিত করতে পারে, এবং তা পেঁছায়—সহজে। জ্যাঠামশাই-এর এই উদারতা, প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি অসুখের বেদনাকে প্রশমিত করেছে। আমরা প্রতিকারের ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছি। মোহিনী, সুহাস, আয়না, শচিপতি,—সকলের জন্যেই তাঁর মায়া। সকলের 'সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে' বাকি জীবনটুকু কাটিয়ে দিতে চান তিনি। জ্যাঠামশাই-এর মনের মধ্যে একটা ব্যাথার চকিত আভাস কি-তু অস্পষ্ট থাকেনি। শচিপতির জন্যে একটা

কাঁটা তাঁর বুকের মধ্যে সর্বদাই যন্ত্রণা ছড়িয়েছে। তিনি চেয়েছিলেন শচির সঙ্গে মানুর বিয়ে হোক; তাহলে ছেলেটা হয়তো ভয়ঙ্কর দুশ্চিন্তার আওতা থেকে বেরিয়ে এলেও আসতে পারে। কিন্তু শচির মন্দ-ভাগ্যের কথা মনে রেখেই তাঁর কথাকে সে-দিন পাত্তা দেওয়া হয়নি।

শচিপতি অন্তর দিয়েই মোহিনীকে ভালবেসেছিল। সে ভেবেছিল এই মৃত্যু অপঘাত—সব কিছু থেকে তাঁকে বাঁচাতে পারবে একমাত্র মানুই —অন্য কেউ নয়, সাবিত্রীর মতই সে হয়তো যমের দোরগড়া থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনবে। কিন্তু কেউ-ই তাঁর হাতে মানুকে তুলে দিতে রাজি হল না। শচিপতি দুঃখের সঙ্গে-সঙ্গে গ্লানির ভার থেকেও মুক্তি পেয়েছিল সে-দিন। বিয়ের পর মরে গেলেও মানুকে তো আর বৈধব্য যন্ত্রণার দুর্ভোগ পোয়াতে হবে না। শচিপতি চোখের সামনে শান্তাকে দেখতে পেয়েছে,—তার খুড়তুতো বোন। বাঁচবার জন্যে সে কত চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু পারল কি? মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই মেলেনি তারও। একটা মানুষের বেঁচে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় যে বিশ্বাস —শেষ বিশ্বাসটুকু —তাও শেষ পর্যন্ত শচিপতির মন থেকে হারিয়ে গেছে। তাঁর সামনে এখন অন্ধকার —নিরন্ধ্র অন্ধকার।

উপন্যাসে অবিনের আবির্ভাব প্রত্যয়-দৃপ্ত ঘোষণার মতই উজ্জ্বল। উপন্যাস স্রষ্টা তাকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছেন যৌবনের প্রতীক হিসাবে। অবিন যে-জীবন বিশ্বাস করে তা হল জাগ্রত; সংশয়, সঙ্কোচ এবং অবিশ্বাসের সেখানে স্থান নাই। অবিনের বাধা-বন্ধনহীন উদ্দামতায় আছে ভেসে যাওয়ার আবেগ। যাবতীয় অসুস্থতার বিরুদ্ধে সে যেন মূর্ত প্রতিবাদ। তার দৃপ্ত পদচারণায় সর্বদাই শুনতে পাওয়া গেছে যৌবনের জয়ধ্বনি: সবুজের উল্লাস,—

চির যুবা তুই যে চিরজীবী,
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।

সবুজ নেশায় ভোর করেছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল - করা

আপন গলার বকুল মাল্যগাছা ।
আয় রে অমর, আয়রে আমার কাঁচা ।।
(রবী-দ্রনাথ,'সবুজের অভিযান')

সুহাসদের বাড়িটা দেখে অবিনের মনে হয়েছে সেটা যেন একটা প্রকান্ড জাদুঘর । সেখানে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে প্রাণহীনতার চিহ্ন । অবিন ওখানে আঘাত হানতে চায় । আয়নাকে নির্দ্বিধায় সে বলে , —

"তোমাদের বাড়িটা একটা যাদুঘর । যত পুরনো আর মরা জিনিস সাজিয়ে রাখতে গিয়ে নিজেরাও মরছ । যমের ধন কী তোমাদের আছে জানি না , ভাই । যতটুকু আছে তার চেয়ে বেশীটাই যে নেই— তোমাদের বোঝানো গেল না । যাক্ গে , একবার কোথাও একটা বড় ধরনের ভাঙন লাগুক । তারপর দেখব ।"

অবিন অন্তরের তাগিদকে কখনই অশ্রদ্ধা করতে শেখেনি । আয়না তার ভালবাসা ও সমস্যা এই সবকিছুই অবিনকে খুলে বলতে পেরেছে । অবিন অভয় দিয়েছে ; তার কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছে আয়না । অবিনের ভালমতই জানা আছে চিরাচরিত সংস্কারকে নির্বিচারে প্রশ্রয় দেওয়ার মধ্যেই মানবিক মূল্যবোধের অমর্যাদা ঘটানো হয়ে থাকে । এটা অবিনের পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব । সে আঘাতে - আঘাতে প্রথানুবর্তনের অচলায়তনকে গুঁড়িয়ে দিতে চায় । এইভাবেই হয়তো জীবন তার যথার্থ আসনটি খুঁজে নিতে পারবে ।

অবিন প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে মোহিনীর অন্তরেও । সে চেয়েছে মুক্তির বন্যায় মোহিনীকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে । মোহিনী কেন এত উদাসীন ? কেন সে নিজস্ব আবেগ -অনুভূতিকে এড়িয়ে থাকতে চায় ? — অবিন এ-সবের উত্তর খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করেছে । আমরা জানি মোহিনীর অন্তরের মধ্যেও আকুলতার উদ্ভাসন অপ্রকাশিত নয় । অ-সুখের সংস্রব থেকে মুক্তির জন্যেই সে স্বামীকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছিল । অবিন প্রকৃতই তার কাছে জাগরণের সুপ্ত । কি-তু এই অবেলায়

সে যে বড় নিরুপায় । অবিনের চিঠি মোহিনী বার বার পড়েছে । সামনে থাকলে সে স্পষ্টভাবে তাকে জানাতে পারত :

> আমি আমার অদৃষ্টকে স্বীকার করে নিয়েছি । যদি স্বীকার না করে নিতাম তবে আমায় ছটফট করে মরতে হত । তুমি বলবে, আমি কেন অদৃষ্টকে স্বীকার করলাম । যদি অদৃষ্টতেই আমার বিশ্বাস থাকত, তবে যে স্বামী জীবটিকে আমি পেয়েছিলাম তার চরণামৃত কী দোষ করল ! তা তুমি বলতে পার । কি-তু সব ফাঁকি, সব আঘাত, সব অসম্মান যে সহ্য করা যায় না । যতটা যায় আমি করেছি । যখন শচিদার সঙ্গে আমার বিয়ে হল না তখন আমি কষ্ট পেয়েছিলাম । সব মেয়েরা যেমন পায় । কি-তু আমি কুয়ায় ঝাঁপ দিতে যাই নি । কেন যাব ? আমি তো অসহায় ছিলাম না । তাছাড়া যে-পুরুষ মানুষ ভাবে, ভালবাসার চেয়ে মরার ভয়টা বেশী, তার ভালবাসার জোর আমি বিশ্বাস করি না । শচিদা আমাকে কতটুকু ভালবেসেছিল, আর কতটা নিজেকে ভালবাসত তার হিসেব সে তো দেখল না । যাক গে, ওটা অনেক পুরনো কথা । তারপর আমার কপালে যে-কদর্য পুরুষটি স্বামীর বেশে এল তার কথা ভাবলেই আমার মনে হয়, এই ক'টা মাস আমি নরকে গলা ডুবিয়ে বেঁচে ছিলাম । সেখান থেকে আমি নিজেকে উদ্ধার করেছি এটাই আমার মহত্ত্বনা ।

মোহিনী জানে সুখ নয়, এক অপরিমেয় গ্লানি প্রতি মুহূর্তে তার সত্তাকে বেদনাচ্ছন্ন করে চলেছে । এতকিছু সত্ত্বেও সে অবিনের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায় । চিরাচরিত রক্ষণশীলতার অন্ধকার গহ্বরে নিজেকে বন্দি করে রাখাতেই তার মনোযোগ বেশি । কি-তু লক্ষ্য করা গেছে মোহিনী যতই অগ্রাহ্য করে অবিনকে

উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, —তার মনের দরজায় অবিন যে দারুণভাবেই কড়া নেড়েছে —তাতে সন্দেহ নাই। অবিনের এই আওয়াজ মোহিনীর বুকের গভীরে সাড়া জাগিয়েছে —শরীরে ও মনে এক অনাস্বাদিত বিহ্বলতার স্বাদ এনে দিয়েছে।

চিকিৎসার জন্যে কলকাতায় আনা হয়েছে শচিপতিকে। অবিন-ই এ ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল। অসুস্থ মানুষটি হয়তো সেরে উঠবে —এই ছিল তার আশা। শচিপতির শারীরিক অবস্থা কিন্তু দিন-দিন আরও কাহিল হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সুহাস অবিনকে বলেছে :

> "শচিদার যা অবস্থা তাতে মেজর অপারেশন খুব রিস্কি। ইন্দু বলছিলেন, ডাক্তাররা এতদিন অবজারভেশনে রাখার পরও কোনো ডিসিসান নিতে ভয় পাচ্ছেন। আমি দুপুরে দত্তসাহেবের কাছে গিয়েছিলাম। যেতে বলে-ছিলেন। তিনি বলছেন, অপারেশনটা ইউজলেস। শচিদা স্ট্যান্ড করতে পারবে বলে মনে হয় না। যদি বা পারেও পোস্ট অপারেটিভ স্টেজে কী হয়, কিছুই বলা যায় না। অকারণ মানুষটাকে ছেঁড়াছেঁড়ি করে কী লাভ।"

শচিপতি সুস্থ হয়ে উঠতে পারে —এই ক্ষীণতম সম্ভাবনাটুকুও শেষ পর্যন্ত লুপ্ত হয়েছে। তাঁর আয়ুর মেয়াদ ফুরিয়ে এল বলে। সুতরাং অনর্থক শক্তি বিধ্বিত করে লাভ নাই। কিন্তু শচিপতির আত্মিক শক্তি কি বহুদিন পূর্বেই নষ্ট হয়ে যায়নি? অদৃশ্য নিয়তির হাতে সে তো অনেক আগেই নির্বিচারে নিজের ভাগ্যকে সঁপে দিয়েছিল। প্রতি মুহূর্তেই তার মনে হয়েছে এই বোধহয় জীবনের অন্তিম লগ্নটি ঘনিয়ে এল। অবিনরা যতই চেষ্টা করুক না কেন —শচিপতি চিকিৎসার অতীত। বহু আগেই ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে তার। এখন শুধু পালা শেষের পালা।

উপন্যাসের শেষের দিকে আমরা লক্ষ্য করেছি মোহিনীর কাছে অবিন ক্রমশই অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। সে বড় দুর্নিবার। মোহিনীর সহস্র অস্ত্রাঘাত কোনও

দায়ই পায় না তার কাছে। রক্ত-মাংসের বেদনা-বিচ্ছিন্ন মোহিনীকে স্বীকারই করতে চায় না অবিন। তার মতে আত্মনিগ্রহের একটা সীমা থাকা দরকার। মোহিনী সবটুকুই ছাপিয়ে গেছে। অন্যদিকে মোহিনীও বুঝে উঠতে পারে না—কোন উপায়ে সে আত্মরক্ষা করবে? তার জীবনের এই ভয়ঙ্কর সুন্দরকে সে প্রতিহত করবে কী ভাবে? একই সঙ্গে অক্ষমতার আর্তিতে আচ্ছন্ন হয়েছে তার মন। অবিনকে এই মুহূর্তে কী দিতে পারে সে? এখন যে বড় অসময়:

মনে মনে আজ আমি অবিনকে বলি
তুমি আমায় ভুলোতে চেয়েছ এ-কথা
আমি বলি না। তোমার সে দুর্মতি
হয় নি। তেমন স্বভাবের মানুষ তুমি
নও। আমার চোখ তাহলে চিনতে
পারত। কি-তু তোমার যাই থাক;
আমার যে উপায় নেই, সাধ্য নেই;
যখন আমার বেলা ছিল তুমি তো
আসনি। এই অসময়ে তুমি আমার
কাছে কিছু চেয়ো না। আমি এখন
এই বাড়ির তিন পুরুষের ইট-পাথর-
মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছি। আমি
আর মানুষ নয়; নিতান্ত পাথর।
এ আমার ভাগ্য। জন্মান্তরে যদি
আমার চাওয়া থাকে, তোমাকে চাইব।
এ-জন্মে তুমি আমার পাওয়ার ধন নয়।

উদ্ধৃতাংশের মধ্যে মোহিনীর হাহাকার পাঠকের কাছে গোপন থাকে না। অবিনকে ভালবাসার স্বীকৃতি জানিয়েও সে অক্ষম। তাকে আপন করে নেওয়ার সাধ্য মোহিনীর আজ আর কোথায়? যখন তার সব কিছু ছিল—তখন আসেনি অবিন। জন্মান্তরে সে অবিনকেই বেছে নেবে; কি-তু এই মুহূর্তে সে তো জাগতিক উদ্বেলতা-বিচ্ছিন্ন এক নিষ্প্রাণ পাথরের মূর্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। দিনানুদৈনিক কর্তব্য কর্মের গণ্ডি থেকে

বেরিয়ে পড়া তার পক্ষে এখন অসম্ভব। মোহিনী জানে এই ভাবে জীবন-যাপনের অর্থ কী হতে পারে? সে জানে—এর মধ্যে শান্তি নাই, মুক্তি নাই। তবুও সেই অ-সুখের হাত থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা আজ আর সে করে না। সুতরাং অবিন তার জীবনকে যতই উত্তাল করে তুলুক না কেন,—তাকে ফিরিয়ে দিতে মোহিনী স্থির-প্রতিজ্ঞ। কি-তু সত্যি-ই কি তার জীবনের 'সর্বনেশে পুরুষ'কে ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব? কাহিনীর অন্তিমে মোহিনী উপলব্ধি করেছে—তার বুকের মাঝখানে দুঃখের পাথরটাতে ফাটল ধরেছে। মনের মধ্যেও জেগে উঠেছে মুক্তির আনন্দ।

> কাকে আমি বাধা দেব, কাকে বলব
> যেয়ো না। ও যে অবিন, আমার
> সর্বনেশে পুরুষ। তার শ্রাবণ আকাশের
> মত গায়ের রঙ, বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণ
> চেহারা, উঁচু মাথা সোজা করে হেঁটে
> যাওয়া আমি শুধু দেখলুম। চোখ ভরে
> আমার জল নামল। বুকের যেখানে দুঃখের
> পাথর জমে ছিল, হঠাৎ দেখি তার কোথাও
> ফাটল ধরেছে। এ কি আমার মুক্তি?
> এ কি আমার আনন্দ? চোখের পাতা
> কাঁপছিল, পা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল।

উপন্যাসটি জীবন-সমীক্ষার এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। অসহায়তার নিগড়ে আটকে থাকা এক তরুণীর দীর্ঘশ্বাস ও আর্তিকে শিল্পী পৌঁছে দিতে চেয়েছেন পাঠকের কাছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা প্রত্যেকেই অসময়ের শিকার। এই অসময় আমাদের নির্জীব করে—জীবনের যাবতীয় উদ্দীপনাকে শোষণ করে নেয়; —যেমনটি ঘটেছে মোহিনীর ক্ষেত্রে। সমস্ত দিক থেকেই সে রাজেশ্বরী হওয়ার উপযুক্ত ছিল। অথচ রিক্ত হৃদয়েই তাকে স্বামীগৃহ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে। তথাকথিত বনেদিয়ানার আড়ালে ব্যাভিচার কী-ভাবে সমাজের নৈতিক মানদন্ডকে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে—মোহিনীর

অ-সুখ থেকে তা ভালমতই প্রমাণ হয় । পিতৃগৃহে ফিরে এসে সে সকলের দায়িত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছে । কি-তু সেখানে সুখ কোথায় ? তদারকি আর পরিচর্যার ভিতরে সময় হয়তো কেটে যায়, কি-তু আভ্যন্তরিক শূন্যতাকে এ-ভাবে ঢেকে রাখা সম্ভব নয় । অবশেষে অবিন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে তার ঘুম ভাঙাতে সচেষ্ট হয়েছে । চেষ্টা করেছে মরা গাঙে নতুন করে জোয়ার বইয়ে দিতে । মোহিনীর অন্তরে ঝড় যে ওঠেনি —এমন নয় । অবিন তাকে কাঁপিয়ে দিয়েছে । অবিনের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে তার বাঞ্ছিত আরাধ্য পুরুষটিকে । তা সত্ত্বেও এক বুক হাহাকার আর তীব্র অ-সুখের মধ্যেই সে অবিনকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে । মোহিনীর অন্তরে যে দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনেছি, —তাতে সময়-সমাজ-সংসারের বিবর্ণ, ম্লান রূপটি-ই আভাসিত

শচিপতি মানসিক এবং শারীরিক —দুই দিক থেকেই অসুস্থতায় আক্রান্ত । চোখের সামনে দুর্ঘটনা -মৃত্যুর ভয়াবহ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করার ফলে তার মনের মধ্যে জন্ম নিয়েছে মৃত্যুর আশঙ্কা । জীবনীশক্তির ন্যূনতম সম্ভাবনাও তার মধ্যে অদৃশ্য । চিকিৎসার জন্যে তাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছে, কি-তু সুফল মেলেনি । সমগ্র জীবনে একবারই শচিপতির মনে বাঁচার ইচ্ছা জেগেছিল, —সাবিত্রীর মত মোহিনী যদি তাকে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরিয়ে আনে । কি-তু শেষ পর্যন্ত সেরকম কিছু ঘটেনি । শচিপতির অভিশপ্ত ভাগ্যের সঙ্গে মোহিনীর ভাগ্যকে সংযুক্ত করতে অসম্মত হয়েছিলেন অভিভাবকেরা । অবশ্য আমরা দেখেছি মোহিনীও পরবর্তীকালে কম দুর্ভাগ্যের শিকার হয়নি । শচিপতির পরিবারে একের পর এক যে রকম অঘটন ঘটেছে, এবং শেষ পর্যন্ত দুশ্চিকিৎস্য অসুস্থতা তাকেও যে ভাবে গ্রাস করেছে —তাতে দুর্জ্ঞেয় নিয়তির অদৃশ্য হাতছানি বারংবার লক্ষিত হয়, অনেক সময়েই যুক্তি দিয়েও যা অব্যাখ্যেয় ।

উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে আয়না এবং তপুর প্রেম সম্পর্কের জটিলতা শেষাবধি অবিনের আন্তরিক প্রচেষ্টাতে দূর করা সম্ভব হলেও সুহাসের জন্যে বুলার বিষণ্ণতা-সুখহীনতা মানবিক সম্পর্কের নৈরাশ্যপীড়িত অধ্যায়টিকে উপযুক্ত করেছে । যে সুহাস আয়নার বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পর সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই-এর কথা চিন্তা করেছে; সে কী করে বুলার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে পারল ? দিদির জন্যে তার বেদনাকে

আমরা কখনও অস্বীকার করব না, কিন্তু নিজেকে সরিয়ে নিয়ে বুলার ভালবাসাকে সে আঘাত করবে কেন? আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত হিসাবে ব্যাপারটাকে উপস্থাপিত করার চেষ্টা হলেও, স্বাভাবিক ভাবনা দিয়ে তার মেনে নিতে আমাদের মন সায় দেয় না।

জ্যাঠামশাই এই উপন্যাসের শ্রদ্ধেয় প্রবীণ চরিত্র। তাঁর জীবনের দুঃখও কিছু কম নয়। শারীরিক অসুস্থতা তাঁর জীবন থেকে অনেক কিছু কেড়ে নিয়েছিল। জীবদ্দশাতেই চোখের সামনে তাঁকে দেখতে হয়েছে অনেক মর্মান্তিক দৃশ্য; শুনতে হয়েছে মোহিনীর ভগ্ন-জীবনের দীর্ঘশ্বাস। শচিপতিও তাঁর মনের আর এক দুঃখ। এত কিছু সত্ত্বেও এই সৌম্য-শান্ত-প্রবীণ মানুষটি ভেঙে পড়েননি। বিচ্ছেদের হাহাকার — অসুখের যন্ত্রণার ভিতরেও উপশমের উপায় অন্বেষণে সচেষ্ট হয়েছেন তিনি। গ্রহণেই যে সুখানন্দের অনুভূতি জেগে ওঠে, —সেই কথা মনে-প্রাণেই বিশ্বাস করেছেন তিনি। এই বিশ্বাসই তাঁর শক্তি এবং বেদনাপর্ব থেকে নিষ্ক্রমণের উপায়।

উপন্যাসের মধ্যে দুটি মৃত্যুর প্রসঙ্গ তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। লীলার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে প্রমাণিত হয় —পারিবারিক ও মানসিক শান্তির অভাবে আত্মহত্যার যতন চরমপন্থাকে বেছে নেওয়া ছাড়া বোধহয় গত্যন্তর থাকে না। পারিবারিক সঙ্কট যে মানসিক বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ, —লীলার মৃত্যু তারই উদাহরণ। অবিনের মা পুণ্যবালার মৃত্যু একটু অন্যরকম। সবকিছুই তাঁর ছিল। তবুও বুকের গভীরে তিনি পুষে রেখে দিয়েছিলেন বিরাট এক শূন্যতা। স্বামী-পুত্র-দাস-দাসী সব কিছুর ভিতরেও এই সুখ-বিচ্যুতি এবং অতৃপ্তি পুণ্যবালাকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুটি হয়তো নিতান্তই দুর্ঘটনাজনিত; তবুও অবিনের কাছে সেটাই অন্য অর্থ নিয়ে ধরা দিয়েছে।

অবিন এই উপন্যাসের অসাধারণ এক চরিত্র। তার কথা ভাবলেই 'শেষের কবিতা'র নায়ক চরিত্রটি আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যায়।[১] প্রথানুগত্যের প্রতি অস্বীকৃতি তাকে আর পাঁচটা চরিত্র থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। অবিন মোহিনীকে পাথরের প্রতিমা হিসাবে মেনে নিতে রাজি হয়নি; ভিতরকার রক্ত-মাংসের বেদনাকৃতিকেও সে উপলব্ধি করতে চেয়েছে। আমাদের মনে হয় অবিন এমন এক চরিত্র —যার মধ্যে নিহিত আছে গভীর জীবনবোধ এবং তীব্র জীবন পিপাসা। সে যাবতীয় অ-সুখ, বেদনা এবং যন্ত্রণার বিরুদ্ধে

মূর্ত প্রতিবাদ । অবিন শুধুমাত্র সমস্যাকে চিহ্নিত করেই থেমে থাকেনি ; উপযুক্ত প্রতিবিধান ও আরোগ্যের জন্যেও তার প্রচেষ্টা অব্যাহত । অসময়ের নঞর্থক ভূমিকা সত্ত্বেও তার মধ্যে সাবলীল জীবন-জিজ্ঞাসার যে লক্ষণ আমরা দেখেছি —তাতে অভিভূত হওয়ার সঙ্গে - সঙ্গে অভিনন্দনও না জানিয়ে উপায় থাকে না ।

এই উপন্যাস সম্বন্ধে যে কথাটি পুনরুল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন , সেটি হল -- অসময় কোনও নির্দিষ্ট আভিধানিক অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ; ঠিক একই ভাবে কোনও বিশেষ চরিত্রের হাহাকারের প্রতিফলনও উপন্যাস শিল্পীর প্রতিপাদ্য নয় । সামগ্রিক ভাবেই যুগের অবক্ষয় এবং কালের ক্ষত্রণাকেই শিল্পী গভীর অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জীবনাধারে বিধৃত করতে চেয়েছেন । সময়ের বন্ধ্যাত্বকে স্বীকার করে নিয়েও ঔপন্যাসিক কিন্তু নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকেননি । প্রচন্ড সংশয়ের মধ্যেও তাই ভোরের বাতাসে যখন নির্মলতার সুরটি জেগে উঠেছে —অসুখী অন্তরের মধ্যে বহুদিনকার জমে থাকা পাথরেও তখন ফাটল ধরেছে : এমনিভাবেই চোখের জলেতে পবিত্র হয়ে উঠেছে মুক্তির আনন্দ ।

জীবন-রহস্যের অফুরান বার্তাকে মোহ' (১৯৭৫) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে আগ্রহী হয়েছেন । জীবন যখন অবসাদে ম্লান —ক্ষত্রণায় উৎকণ্ঠিত তখনও কিন্তু তা' ভোরের আবেগে মথিত হয় —সুপ্তির জোয়ারে প্লাবিত হয় । দুঃসহ ক্ষত চেপে ধরেও প্রত্যক্ষ করতে চায় পৃথিবীর বর্ণ-বৈভবকে । বিস্তীর্ণ যাত্রা-পথে ব্যস্ততার শরিক আমরা সকলেই । অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে প্রায়শই মনে হয় —ভুল হয়ে গেল বোধহয় অনেক কিছুই । তখনই ফিরে তাকানোর পালা । স্তব্ধ হয় তখন গতির ঊন্মত্ততা । ব্যর্থতার নৈরাশ্যে ডুবে যেতে চায় সমস্ত সত্তা । তবুও মাঝে-মধ্যেই এক মায়াবী আলোর বিচ্ছুরণ ঘটে চোখে মুখে । ধীরে ধীরে তা পৌঁছে যায় হৃদয়ের গোপন কন্দরেও । সেই আলো মাখা চোখে অপরূপ হয়ে ওঠে হারানো সে কবেকার ফেলে আসা দিন । শুধু ক্ষত্রণার বিক্ষোভে উত্তাল হয় হৃদয় । অনেক কিছু হারিয়ে

ফেলেও নতুন করে ফিরে পাওয়ার আনন্দে ব্যাকুল হয়ে উঠতে চায় মন। অস্তিত্বের প্রতিটি অণুতে সঞ্চারিত এই মুগ্ধ মেদুরতাই মোহ।

এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র যতিকিশোর। জেদি ঘোড়ার মত সে ছুটে চলেছিল। একদিন কিন্তু তাকে মুখ থুবড়ে পড়তে হল। 'হিরো' হওয়ার নেশা পেয়ে বসেছিল যতিকিশোরকে —এর জন্যে অনেক কিছুই তাকে খোয়াতে হয়েছে। এতদিন যাবৎ তার ভাবনা ছিল সে শুধু জিতেই এসেছে, কিন্তু একদিন তাকে উপলব্ধি করতে হল প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই সে পরাজিত, বিধ্বস্ত। জয়লাভের কোনও অবকাশই তার সামনে ছিল না কোনওদিন। এই যতিকিশোরের জন্যেই বিনষ্ট হয়েছে তাদের বংশের সুউচ্চ সম্ভ্রম-বোধ। তার জন্যেই দূরে সরে গেছে মা-বাবা-ভাই-বোন —প্রায় সকলে। স্ত্রীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক —তাও রীতিমতন অ-সার। যতিকিশোরের জঘন্য কীর্তিকলাপের জন্যেই একটা পরিবারকে চরম লজ্জার মধ্যে শেরপুর ছেড়ে যেতে হয়েছে। অপরিসীম লাঞ্ছনার শিকার হতে হয়েছে সরসী আর মায়ালতাকে। আশ্চর্যের কথা হল, এই সরসী আর যতিকিশোর একদিন অনেক অন্তরঙ্গ মুহূর্তকে কাটিয়ে দিত শুধুমাত্র পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়েই। সমাজবিরোধী গুন্ডাদের ভোজালির আঘাতে যতিকিশোরের বাঁচবার কথা ছিল না; শেষ পর্যন্ত তবুও বেঁচে গেল সে। আরও বিস্ময়ের ঘটনা হল —যার প্রতি সে একদিন চরম অবিচার করেছিল, সেই সরসী-ই তাকে সযত্ন মমতায় গ্রহণ করল। সরসী বুঝতে পেরেছিল পাপ আর কু-কর্ম-এই গন্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে যতিকিশোর এখন নতুন এক মানুষ। রূপান্তর ঘটেছে তার। গভীর সহানুভূতি এবং মমতায় আকুল হয়ে সরসী যতিকিশোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। শেরপুরে ফেলে আসা দিনগুলি হয়তো আর কোনওদিনই ফিরে আসবে না; তবুও স্মৃতির দরজায় কড়া নাড়তে নাড়তে যতিকিশোর আর সরসী দু'জনেই পৌঁছে গিয়েছে শেরপুরে। সেখানে বদলে গেছে কত কিছুই। এমনিভাবেই বোধহয় সব কিছু পালটে যায়। অনেক পরিবর্তন —অনেক পালা বদলের মধ্যেও শেষ পর্যন্ত দু'টি মানুষ মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। বিদায়ী সূর্যের আভাতে বিষণ্ণতা সত্ত্বেও তারা উজ্জ্বল। নতুন করে নিজেদের খুঁজে পাওয়ার আনন্দ তাদের চেতনাকে স্পর্শ করে যায়।

উপন্যাসটির মধ্যে আত্ম-সমীক্ষা ও স্বীকারোক্তি দুই-ই লক্ষিত হয়েছে। সঠিক লক্ষ্যের অভাবে জীবন-তরী কীভাবে দিশাহারা হয়ে যায় —যতিকিশোর তা বুঝতে পেরেছিল। যখন বোধোদয় হল – তখন কিন্তু অনেক বেলা হয়ে গেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যতিকিশোর বিচলিত হয়নি। কু-কর্মের পরিণামকে দ্বিধাহীন ভাবেই মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছিল সেদিন। অকপটে সে সব স্বীকার করেছে সরসীর কাছে। সরসী তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি; বরং নতুনভাবে বাঁচতে চাওয়া অসহায় মানুষটিকে পরম মমতায় —আকুল আবেগে জড়িয়ে ধরেছে। যতিকিশোরের শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক যন্ত্রণা, সমস্ত কিছু মুছে দিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছে সরসী।[২] যে স্বপ্নটা একদা হারিয়ে গিয়েছিল দু'জনের চোখ থেকে; তাকে নতুনভাবে খুঁজে পাওয়ার আনন্দে উচ্ছল হয়ে উঠেছে দুটি মনই।

কাহিনীর গোড়ার দিকে যে যতিকিশোরকে আমরা দেখতে পাই, সে অসুস্থ। অথচ এই মানুষটি একদিন সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিল।

> যতিকিশোরকে হাসপাতাল ছেড়েছে আজ প্রায় মাস দুই আড়াই। এতোদিন সবই স্বাভাবিক হয়ে আসা উচিত ছিল। হয়ত হয়েছে। তবু যতিকিশোর প্রথম দিককার সাবধানতা ও ভয় পুষে রেখেছে, পিঠ টানটান করলে কিংবা বড় করে পা ফেললে, নীচু হয়ে কিছু কুড়োতে গেলে তার মনে হয়, পেটের সেলাইয়ে টান লাগছে। এই টানটা সে কখনো কখনো অনুভব করে বলেই কোমর এবং পিঠ খানিকটা নুইয়ে পেটের দিকটা সঙ্কুচিত করে রাখার চেষ্টা করে।

যতিকিশোর এখন খুব সতর্ক হয়ে চলাফেরা করে। হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার সময় ডাক্তার তাকে এইরকম উপদেশই দিয়েছেন। সরসীদের কাছে এসে যতিকিশোর মুক্তি পেয়েছে; কিন্তু তার মনের মধ্যে যে সংশয় জেগেছে তার অবসান ঘটেনি। দূর থেকে ঝোড়ো হাওয়া ভেসে আসার সাথে সাথে যতিকিশোর পরিমাপ করার চেষ্টা করে তার দুঃখের ব্যাপকতা :

দূরত্ব কোনো সময়েই সঠিক করে বোঝা যায় না অনেক কিছুরই । যেমন, যতিকিশোর বুঝতে পারছে না—তার জীবনের ঠিক কোন পর্ব থেকে তার সেই দুঃখ শুরু হয়েছিল । বাল্য থেকে, না কৈশোর থেকে, না কি যৌবন থেকে । যখনই শুরু হোক, যতিকিশোর তখন দুঃখটুঃখ অনুভব করেনি । এখনও সে পুরোপুরি বুঝতে পারছে না, দুঃখের শুরু সেই তখন, নাকি আরও পরে, আরও পরে .....।

একসময় যতিকিশোর সরসী মায়ানতার উপরে অনেক অবিচার করেছে । সেই সরসীর ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বাড়িতে আসা যতিকিশোরের পক্ষে খুবই লজ্জার । শেষ পর্যন্ত সে এসেছে । 'কোনো মানুষের বেলায় হয়ত এই রকম হয়, ভাগ্য - মানে ভাগ্য যদি যদি থেকে থাকে — তবে চাকার মতন ঘুরে আসে, বা সেই মানুষটিকে পুরো একপাক ঘুরে আবার সেখানে ফিরে আসতে হয়, যেখান থেকে সে পালিয়ে গিয়েছিল ।' সরসী আর যতিকিশোর যখন অতীত খুঁড়তে ব্যস্ত থেকেছে, তখন দু'জনের মনই ভারি হয়ে উঠেছে । বিষণ্ণতার মেঘকে ছুঁয়ে গেছে দু'জনের ভাবনাই । ছেলেবেলায় যতিকিশোরের পায়ে একটা কাটার চিহ্ন ছিল । বয়স বেড়েছে —শরীর বেড়ে উঠেছে; কি-তু দাগটা রয়েই গেছে । এই প্রসঙ্গে সরসীকে যতিকিশোর যা বলেছে তাতে এই দাগকে ছাপিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে মনের ক্ষতও, —' বোধ হয়, এই সব দাগ এই রকমই, যত দিন যায়, বড় হওয়া পর্যন্ত, বেড়েই যায় ।' দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে যতিকিশোর । অনেকদিন পর সরসীকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে যতিকিশোরের চোখে ধরা পড়ে কত না পরিবর্তন ! হারিয়ে গেল সেই অষ্টাদশী সরসী ; তবু তার মুখের আদলে কোমলতার রেশটুকু একেবারে মুছে যায়নি । যতিকিশোর দুঃখ পেয়েছে এই ভেবে, 'সরসী, তারই মতন পড়ন্ত দিনের ছোঁয়া পেয়ে ম্লান হয়ে আসছে ।' সরসীদের বাড়িতে বিছানায় শুয়ে যতিকিশোর ভাবছিল অনেককিছুই । হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল স্ত্রী মীনার কথা ।

মীনা এতোক্ষণ তার ঘরে শুয়ে পড়েছে ।
মীনা অনেকদিন ধরেই আলাদা শুচ্ছে ।
কিংবা যতিকিশোর নিজেই তার শোবার
ঘর আলাদা করে নেওয়ায় মীনা আগের
শোবার ঘরটা একলা ভোগ করছে । এতে
তার সুবিধে, যতিকিশোরেরও । সারাদিন
স্বামী স্ত্রীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ, মুখোমুখি
বসা এতো কম যে, শোবার সময় এক
বিছানা ভাগাভাগি করার কোনো মানে
হয় না, বরং শুলেই আড়ষ্ট লাগে, কথা
কাটাকাটি হয়; একজন অন্যজনের ওপর
মনের রাগ বিতৃষ্ণা প্রকাশ করে । ছোট
থেকে বড় হয়ে ঝগড়া, একেবারে নোংরা
কথাবার্তায় নেমে যেতে হয় ।

প্রকৃতপক্ষে যতিকিশোরের জীবনে মীনা নামের স্ত্রী-লোকটি নিতান্তই এক অর্থহীন শব্দ, —যদিও তাকে লাভ করার জন্যে যতিকিশোর একদা আর সব কিছুকে তুচ্ছ করেছিল ।

মা-বাবা-ভাই-বোনের সঙ্গে যতিকিশোরের সম্পর্ক একেবারেই ক্ষীণ । এক-আধবার—কখনও-সখনও সাক্ষাৎ যে ঘটে না, তা নয়; তবে সেটা নিছকই দায়সারা । এর জন্যে যতিকিশোর আত্মীয় স্বজনকে দোষ দেয় না । সে নিজেই এর জন্যে দায়ী । সে ' একেবারেই নিরাশ, ক্ষুব্ধ, ব্যথিত করেছে মা-বাবাকে । আহত করেছে, লজ্জিত করেছে । পারিবারিক সম্মানকে একেবারে ধুলোয় মিশিয়েছে ।' যতিকিশোরের মনে পড়ে যায় হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকার সময় তার উদ্দেশ্যে বাবার কিছু কথা ।

বাবা হাসপাতালে একদিন বলেছিলেন, 'সেরে
উঠে তুমি আমাদের কাছে যাবে না বোধহয় ?
যতিকিশোরের দুর্বল শরীর, হলুদ চোখ নিয়ে
শুয়ে থাকতে থাকতে আস্তে মাথা নেড়েছিল ।

'জানি তুমি যাবে না । আমিও তোমায়
জোর করছি না ।....একটা কথা কি জানো,
আমরা পুরোনো লোক, ঠাকুর দেবতা ভূত প্রেত
কপাল নিয়তি সবই বিশ্বাস করে বসে আছি ।
তোমার কপালে এই ভোগ ছিল । আমি জানতাম
একদিন তুমি বড় জায়গা থেকে ঘা খাবে না গেলে
এই সংসারটাই মিথ্যে হয়ে যায় ।'

হাসপাতালে যতিকিশোরের সঙ্গে সরসীর দেখা হয়ে গিয়েছিল আকস্মিকভাবেই । সরসী আসলে দেখতে গিয়েছিল প্রমথবাবুকে । উনি একই সেক্সনে চাকরি করেন । ওখানেই সরসী খেয়াল করল কে যেন তাকিয়ে রয়েছে তার দিকে ।

''যতি না ?''অস্ফুটভাবে বলল সরসী ।

''শশি ।''

সরসী স্তব্ধ, নির্বাক । তার সমস্ত শরীর
যেন কেন চমকে উঠে ভেতরে ভেতরে কাঁপছিল ।
চোখের পলক পড়ছিল না । বুকের মধ্যে
এলোমেলো ঘা পড়ছিল ।
''তুমি এখানে ? হাসপাতালে ? সরসী কেমন
যেন বিপর্যস্ত বোধ করছিল । যতিকিশোর মাথা
নাড়ল । ম্লান মুখে হাসল * * * *
কথা বলতে খানিকটা সময় লাগল
সরসীর ।
''কি হয়েছে তোমার ?
যতিকিশোর পেটের দিকটা দেখাল ।
কিছু বলল না ।
''তুমি কোথায় এসেছ ?''
সরসী প্রমথবাবুর কথা বলল । তারপর
জিজ্ঞেস করল,

"তোমার পেটে কি হয়েছে ?"

"ছুরি খেয়েছিলাম ।"

"ছুরি ?"

"ভালই মেরেছিল , ওপর থেকে নীচে ।"

যতি-কিশোর এমনভাবে বলল যেন ব্যাপারটার মধ্যে কোনো নাটকীয়তা নেই , শিহরণ বা বীভৎসতা নেই ।

যতিকিশোরকে দেখার জন্যে হাসপাতালে প্রায়ই আসত সরসী । এই যতিকিশোরের জন্যে তাদের পরিবারকে কী-ভাবে উৎপীড়িত হতে হয়েছিল , তা ভাল করেই জানা আছে তার । কি-তু সময়ের শুশ্রূষা অনেক কিছুই ভুলিয়ে দেয় । তাই অসুস্থ – ভগ্নস্বাস্থ্য যতিকিশোরকে দেখার পর থেকে সরসীর মনটা অন্যরকম হয়ে গেল । সেই দুর্দান্ত যতিকিশোর কেমন যেন মিইয়ে গেছে । নুয়ে পড়েছে তার গর্বোদ্ধত কাঠামো । শরীরে ও মনে-- দুটি দিক দিয়েই মানুষটি চরমভাবে বিপর্যস্ত । বিধ্বস্ত , ম্লান , পরিবর্তিত মানুষটির জন্যে শুধু সমবেদনা নয় ; সরসীর বুকের ভিতরে তার চেয়েও বেশি কিছু অনুভূতি জেগে উঠেছিল ।

আমরা লক্ষ্য করেছি --নিজের কথা ভাবতে -ভাবতে যতিকিশোরের মন অনুশোচনায় ভারী হয়ে উঠেছে । তার মনে পড়ে যাচ্ছিল তাদের বংশের আভিজাত্য আর সম্ভ্রমের কথা ; যেখানে সে কালি ঢেলে দিয়েছে । নিজস্ব সাফল্যে কত উচ্ছ্বাস --কত উল্লাস-ই না সে করে এসেছে এতদিন , এখন বুঝতে পারে সব অর্থহীন । সরসীর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা হয়ে যাওয়ার বেশ কিছু আগে থেকেই সে অবশ্য বুঝতে পারছিল-- তার জীবনটা একটা শুকনো ইঁদারার মত --অন্ধকারে ঢাকা । শূন্যতার বোধ তাকে আর্ত করে তুলেছিল । ছেলেবেলাতে মারামারি করে বন্ধুদের চোখে হিরো হয়ে গিয়েছিল যতিকিশোর । সারাটা জীবনই নায়কের মত নিজের জয়ধ্বনি শুনে তৃপ্তি পেতে চেয়েছিল সে । হঠাৎ-ই তার মনে হল --সব কিছু ভুল হয়ে গেছে । সুখ তার কর-ধৃত নয় । এই সুখের সন্ধান কোনও দিনই সে পায়নি ।

সে বরাবরই উইনার্স গেম্ খেলেছে ।
খেলতে খেলতে চল্লিশ পেরিয়ে হঠাৎ
সে থামল , তারপর একদিন অনুভব
করল , সত্যিই কি সে —যতিকিশোর
মিত্র , রাজসূয় যজ্ঞের ঘোড়ার মতন
দিগ্বিজয় সেরে ফিরে এসেছে—সর্বত্র
জিতেছে ? নাকি , তার এই খেলা শুধু
হারের ?

শেরপুরে থাকতে থাকতে সরসীদের জীবনও বিভিন্ন কারণে বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল । মাসি মায়ালতাকে নিয়ে তাদের একটা সমস্যা ছিলই । মাসি বরাবরই একটু ছেলেটেলে নিয়ে খেলা পছন্দ করত । স্বভাবসুলভ অহঙ্কারবশত এইসব করে সে আনন্দ পেত । স্বাভাবিক কারণেই মফস্বল শহরে দুর্নাম রটেছিল তার । এর উপর সরসীর মায়ের হল খারাপ ধরনের অসুখ । সরসীর বাবাও অফিসে হিসেব-পত্র নিয়ে ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়ল ।

দেখতে দেখতে সংসার ভাঙতে লাগল ।
অশান্তি আর অশান্তি । অভাব অনটন ।
বাবা যেন কার পরামর্শে পড়ে সামান্য
জমিজমা বেচে দিল । পানের নেশা থেকে
মদের নেশায় উঠল বাবা । মা একদিন
মাসিকে খোলা বঁটি নিয়ে মারতে গেল ;
বাবা বেশ বুঝতে পারল , মা'র মাথা
খারাপ হয়ে আসছে । বাবারও মাথা
নষ্ট হয়ে যেতে লাগল । আর মাসি ?
মাসি যে কত কীর্তিই করল ।

মাসির শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয়েছিল , কিন্তু কিছুদিন পরেই ফিরে এসেছে সে । ওখানে মায়ালতার পোষায়নি । স্বামী বা অন্যান্যরা যে দুর্ব্যবহার করেছিল তা নয় ।

আসলে সরসীর মনে হয়েছে, 'যার কোনো তাপ-উত্তাপ নেই, যে দেমাকী বউয়ের স্বভাব বোঝে না, ছটফটে শরীর-মন বোঝে না, শুধু খাওয়া পরা বোঝে,' তার সঙ্গে ঘর করা মাসির পক্ষে সম্ভব ছিল না। এ ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল।

মানুষ যে কত বিচিত্র হয় তার
বুঝি লেখাজোখা নেই। কে বুঝেছিল,
মাসি যেমনই করুক, তার স্বভাব
যেমনই হোক, মাসির মনের তলায়
তলায় যে মানুষটির ঠাঁই ছিল সে
হল মাসির জামাইবাবু। ততদিনে
সব তছনছ হয়ে গেছে। সরসী যথেষ্ট
বড় হয়েছে। তার আর কিছু অজানা
নেই। শেরপুরে তাদের নিয়ে রঙ্গ আর
তামাশা, কত যে দুর্নাম! বাবারও
চাকরি যায় যায়। শেরপুরের বাড়ি
বেচে দিয়ে সরসীদের পালাতে হল।

ছেলেদের নিয়ে মাতামাতি করা, তাদের নাচানো,—এইসব কিছুই পরিপূর্ণ যৌবনা মায়ালতার স্বভাবসুলভ অহঙ্কারের পরিচয় বহন করেছে। এর জন্যে বহু দুর্নাম রটেছিল তার, সমাজের চোখে অনেক ছোট হয়ে গিয়েছিল তাদের পরিবার। মায়ালতার বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও নিরীহ-শান্ত স্বভাবের স্বামীকে উত্তাপহীনতার অভিযোগে সে যেভাবে বাতিল করেছে—তা বিস্ময়কর। একই সঙ্গে জামাইবাবুর প্রতি তার আসক্তিও যথেষ্ট আপত্তিকর। পরে অবশ্য মায়ালতাকে পরিত্যক্ত স্বামীর জন্যে অনেক হাহাকার করতে হয়েছে। তখন রীতিমত অসহায় অবস্থা সরসীদের। কাজের জন্যে সাসারামে গিয়ে খুন হয়ে গেল বাবা। ছোট-ভাইটাও জ্বরে ভুগে মারা গেল। এই সময় দেবতার মতই এগিয়ে এলেন একটি মানুষ। মেসোমশাই। উনি তখন কলকাতায়। ছোট একটা দোকান চালান। সস্নেহে আশ্রয় দিলেন সরসী আর মায়ালতাকে।

যতদিন মেসোমশাই বেঁচে ছিলেন
সরসী তাঁর স্নেহ পেয়েছে। আর তাঁকে

দেখে শিখেছে, মানুষ কত উদাসীন অথচ
নম্র, নিরাসক্ত অথচ মমতাময় হয়।
মাসি তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছিল বলে, তাঁকে
ফেলে রেখে নিজের সুখ খুঁজতে গিয়েছিল
বলে কোনো রাগ, অভিযোগ, ঘৃণা তিনি
রাখেননি। মাসি ফিরে আসায় তিনি যে
আহ্লাদে ডুবে গিয়েছিলেন তাও নয়। সমস্তটাই
যেন তিনি কর্তব্যের অংশ বলে গ্রহণ করেছিলেন।
উপায়হীনা অসহায়দের আশ্রয় দেওয়া তাঁর
উচিত বলে মনে হয়েছিল, তিনি শান্ত ও
শিষ্ট ভাবেই আশ্রয় দিয়েছিলেন। ধর্মভীরু,
ভক্ত নিরভিমানী এই মানুষটি সরসীকে কোথায়
যেন বড় একটা আশ্রয় দিয়ে একদিন শীতের
ভোরে চলে গেলেন।

মাসি সেদিন স্বামীর জন্যে এমন করে
কেঁদেছিল --মনে হচ্ছিল কোনো পশু যেন
মাথা খুঁড়ে লুটোপুটি খেয়ে কাঁদছে।

এরপর নানান ঘটনার মধ্যে মামা সরসীদের নিয়ে এল নিজের কাছে। সরসী একটা চাকরিও জুটিয়ে নিয়েছিল।

কাহিনীর মধ্যে আমরা দেখেছি শেরপুরের জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে যতিকিশোর ও সরসীর মন। সেখানে না গেলে যেন স্বস্তি নাই —মুক্তিও নাই। শেরপুর এখন অনেক বদলে গেছে। এখানে এসে ওই দু'জন তাদের অপগত কৈশোরের—যৌবনে প্রবেশ করে। একই সঙ্গে সুখ ও বেদনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে দুটি মন। দু'জনের কথাবার্তাতেই আবেগ-উচ্ছ্বাস স্পষ্ট। কিন্তু বিশেষ ভাবেই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যতি কিশোরের স্বীকারোক্তি। এই স্বীকারোক্তি ব্যর্থতার —পরাজয়ের। যতিকিশোর সরসীকে বলেছে, —

"তুমি তো শুধু ভালই বেসেছিলে শশি,
এখানে কোন পাপ রেখে যাও নি।
আমি যে অনেক পাপ রেখে গিয়েছিলাম।"
সরসী ঘাড় ফেরাল বেঁকা করে। যতি-
কিশোর বলল, "তা বলে তুমি ভেব না,
আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছি। প্রায়শ্চিত্তে
আমি বিশ্বাস করি না। শুধু স্বীকার করতে
এসেছি, হ্যাঁ, আমি হেরে গিয়েছি।"

শেরপুরের মাটিতে এসে যতিকিশোর মুক্তির বাতাস নিতে সমর্থ হয়েছে। সে অকপটে সরসীর কাছে নিজের দুষ্কর্মের কথা কবুল করে ভারমুক্ত হতে চেয়েছে। তীব্র অসুখের যন্ত্রণা থেকে মুক্তিকামী মানুষটিকে বড় অসহায় আর ম্লান মনে হচ্ছিল সরসীর। শেরপুরের এক সাধারণ ছেলে যতিকিশোর মিত্র অনেক কিছু পাওয়া সত্ত্বেও সত্যি-ই বড় একা। নিজেকে সে তুলনা করেছে পরিত্যক্ত কোনও কুয়োর সঙ্গে। সরসীর কাছে যতিকিশোর স্বীকার করেছে:

যাক গে ...জীবনের একটা সময় আসে যখন
পায়ের মাটি হঠাৎ কেমন কাঁপতে শুরু করে।
অতর্কিত আমার করেছিল। চল্লিশ পেরিয়ে এসে
একদিন দুঃস্বপ্ন দেখলুম, * * * *
কতদিনের ক্লান্তি বিষাদ অবসাদ আমায় জড়িয়ে ধরল।
এমন নিঃসঙ্গ যে, আমার মনে হত, আমি নিজের
মধ্যে একটা পরিত্যক্ত কুয়ার মতন পড়ে আছি। এই
নিঃসঙ্গতা আমাকে ভূতের মতন তাড়া করে বেড়াত।
বুঝতে পারতাম না কেন এমন হল? কেন? পেছন
ফিরে তাকাতাম। বারবার। কারণে অকারণে।
শেষে আমার মনে হল, এতকাল যে খেলা খেলে
এসেছি, সে-খেলা জয়ের নয়। আমি প্রতিবার ভেবেছি,

> আমি ন্যায্য খেলা খেলছি এবং জিতছি।
> সেই স্কুলের ঘটনা থেকেই। কিন্তু এতকাল
> পরে অনুভব করলাম, প্রত্যেকটা খেলাই
> ছিল হারের, মানুষ ও-খেলায় শেষ পর্যন্ত
> জেতে না।

হেরে যাওয়ার মর্মান্তিক ভাবনাটাই বোধ হয় যতিকিশোরের ভিতরে আমূল পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিল। অনেক অন্যায় সে করেছে। কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়েই সমাজবিরোধী গুণ্ডাদের হাতে শেষ হয়ে যেতে বসেছিল সে। ঘোড় ফেরার আওয়াজ শুনতে পাওয়া মানুষটি সে-দিন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক আর তার মেয়েকে গুণ্ডাদের হাতে লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাবার জন্যে অনায়াসেই এগিয়ে এসেছিল, স্বার্থপরের মত অন্য দিকে ঘুরে যায়নি। ওরা অবশ্য যতিকিশোরকে ছেড়ে দেয়নি। রাস্তার বাতি নিভিয়ে দিয়ে—ছোরা আর সাইকেলের চেন হাতে তাকে ঘিরে ধরেছিল। যতিকিশোরের কাছে এ-সব নতুন নয়। তবু সে পালালো না। তার অনুভবে তখন জ্বলজ্বল করে ভাসছে তারই পাপের ছবি। বড় কদর্য সে ইতিহাস। তার আচরণও ছিল এই গুণ্ডাদের মতই। মানুষের উপর উৎপীড়ন সে-ও তো কম করেনি। ভোজালির আঘাতে পেটে অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে যতিকিশোর লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে। এই কষ্টের বহু আগে থেকেই তাকে অবশ্য ছটফট করতে হয়েছে; অনুশোচনার দাহ বড় ভয়ঙ্কর। যতিকিশোর জানিয়েছে:

> চেষ্টা করলে আমি নিজেকে হয়ত বাঁচাতে পারতাম।
> হয়ত বাঁচতাম। কিন্তু আমার কী যে হল, আমি
> নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করলাম না, চেঁচালাম না,
> ছোটবার জন্যে পা বাড়ালাম না। চুপ করে দাঁড়িয়ে
> থাকলাম। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলাম। ওরা
> এল, চারদিক গোল হয়ে ঘিরে। সামান্য নেশার
> মাথায় আমার মনে হল, যতি, কি যায় আসে—কি
> তোমার যায় – আসে —জীবনে। ওরা তো তোমারই

কীর্তি । ....শশি , আমি একটুও নড়িনি ,
চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলাম , এমন কি যে —
ছেলেটা ভোজালি তুলল , তাকেও দেখলাম ।
....তারপর পলকের মধ্যে অনুভব করলাম
পেটে আমার অসহ্য যন্ত্রণা .....

শেরপুরের বুকে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল যতিকিশোর আর সরসীর আবেগঘন সম্পর্কের বন্ধন । ভুল বোঝাবুঝির অন্ধকার সাঁতরে এসে এই শেরপুরের বুকেই তারা প্রগাঢ়তার মায়ায় সমাচ্ছন্ন হতে চাইল । পিছনে পড়ে থাক অবিচার , উৎপীড়ন , অবিশ্বাস আর অসুস্থতার কলঙ্কিত অধ্যায় । যতিকিশোর এবং সরসীর সামনে এখন উত্তরণের নব-দিগন্ত ।

যতিকিশোর একবার আকাশের দিকে তাকাল ।
তার বুকের তলায় শশী । মাথার ওপরে
শশী , নীচে শশী ।
সরসী তার দীর্ঘ চুম্বন শেষ করার আগেই
চোখের জলে যতিকিশোরকে ভিজিয়ে দিল ।
যতিকিশোর তার যৌবন থেকে শিশুকাল ,
শিশুকাল থেকে আরও কতদূরে —কত যুগান্ত দূরে
চলে গেল , যেন সে এই উল্কাপিণ্ডের কোনো
দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় আদিম জ্বলন্ত শরীরে ফিরে
যাবার চেষ্টা করছে , যেখানে সে নিজের সমস্ত
অস্তিত্ব লুপ্ত করে দিতে চায় । সরসী অস্ফুট
স্বরে বলল , "তুমি কাঁদছ ? "
যতিকিশোর বলল , "তুমিও কেঁদেছ ।"

উপন্যাসে অনুসন্ধেয় সুখের উপমাগুলি লক্ষ্য করতে গিয়ে সহজেই আমাদের চোখের সামনে ধরা পড়ে সুখের স্পর্শ থেকে বিচ্যুত বিভ্রান্ত যতিকিশোরের গভীর

যন্ত্রণা, সরসীর বেদনা এবং মায়ালতার বিষণ্নতা। উদ্‌ভ্রান্তের মত শুধু ছুটে যেতে চেয়েছিল যতিকিশোর। যে কোনো প্রকারেই হোক — সে শুধু শুনতে চেয়েছিল নিজের জয়ধ্বনি; ভেবেছিল —এতদিন ধরে শুধুমাত্র জয়ের খেলাই খেলে এসেছে সে। কিন্তু একটা সময় বুঝতে পারল জয়ের মালা তার গলাতে কোনওদিনই দোলেনি। চেতনার দর্পণে নিজের ব্যর্থ -বিধ্বস্ত চেহারা দেখে শিউরে উঠেছে সে। এই সবের জন্যে যতিকিশোর ক্ষয়িষ্ণু সামাজিক পরিস্থিতিকেই দায়ী করেছে। আক্ষেপ করে সে সরসীকে বলেছে, —

আমরা যে হাওয়ায় মানুষ হলাম, আর
যে হাওয়ায় জীবন প্রায় ফুরিয়ে ফেললাম—
সেই হাওয়া বড় প্রবঞ্চক। এই হাওয়া
আমাদের অবিশ্বাস, সন্দেহ করতে শিখিয়েছে,
হিংস্র নির্মম হতে শিখিয়েছে, আমাদের
উন্মত্ত করেছে, লোভী করেছে; আমরা
রুক্ষ নির্দয় চোর ভাঁড় হারামজাদা শয়তান
হয়ে উঠেছি।

মীনার সঙ্গে যতিকিশোরের যে দাম্পত্য সম্পর্ক, লক্ষ্য করা গেছে তা বড়ই ভঙ্গুর। প্রতিযোগিতার ভিতরে সে মীনাকে মুঠোর মধ্যে আনতে চেয়েছিল। পরবর্তীকালে প্রেম বা ভালবাসা নয়; শূন্যতা-বিরক্তি -হতাশা এই সব কিছুর মধ্যেই হাঁপিয়ে উঠেছে তাদের স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবন। কিছুদিন কাটার পরেই যতিকিশোর বুঝতে পেরেছিল 'সে ভাঁড় হয়ে যাচ্ছে। মীনা তাকে চতুষ্পদ জন্তুর মতন হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।' মীনার সঙ্গে থাকতে গিয়ে বিন্দুমাত্র সুখ খুঁজে পায়নি যতিকিশোর। বাইরেটা সাজানো-গোছানো ঠিকই, কিন্তু ভিতরটা যে একেবারেই ফাঁপা। যতিকিশোর যে-দিন থেকে বেঁকে বসল —অর্থাৎ মীনার তালে তাল দিতে অস্বীকার করল, সে-দিন থেকেই শুরু হল অশান্তির নতুন পর্ব। এই অ-সুখ থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

শেরপুরে যতিকিশোর তার সাগরেদদের নিয়ে যা করে বেড়িয়েছে তা এক কথাতে জঘন্য। মায়ালতা ছেলেদের নাচিয়ে আনন্দ পায় সত্যি, কিন্তু তার জন্যে যতিকিশোর

যে-ভাবে তাদের বাড়ির সামনে ব্যান্ড বাজিয়েছে —হিজড়ে নাচিয়েছে —তার মধ্যে সুস্থতার পরিচয় নাই । যতিকিশোর এবং সরসীর মধ্যে যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা থাকলেও -- সে তুচ্ছ কারণে যে-ভাবে সব কিছু অস্বীকার করেছে, তাতে তার নিষ্ঠুরতার পরিচয় স্পষ্ট ।

জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে যতিকিশোর বুঝতে পারল—তার জমার ঘরে বিরাট এক শূন্য । সে পরিত্যক্ত কোনও কুয়োর মতই অন্ধকারাচ্ছন্ন । সুখহীনতা ও একাকিত্ব তাকে অস্থির করে তুলেছে । নিজের সঙ্গে নিজের মুখোমুখি হতে হতে যতিকিশোরের মধ্যে জেগে উঠেছে নতুন এক মানুষ । সেই মানুষটি সমাজবিরোধী গুন্ডাদের বিরুদ্ধে পর্যন্ত রুখে দাঁড়াতে ভয় পায়নি । উন্মত্ত ভোজালির আঘাতে লুটিয়ে পড়ার পূর্ব মুহূর্তেও যতিকিশোর নড়েনি বিন্দুমাত্র । ক্ষত-বিক্ষত মানুষটি বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে, চেয়েছে জীবনের বিনিময়ে সত্যের দাবিকে স্বীকার করে যেতে ।

বাঁচার কথা না থাকলেও মরেনি যতিকিশোর । নতুন করে বাঁচল সেই দিন, যখন হাসপাতালের বেড়ে শুয়ে থাকতে দেখে সরসী এগিয়ে এল । যতিকিশোর যে-ভাবে সরসীদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছিল, —তাতে মুখে থুতু ছিটিয়ে দিয়ে সরসী চলে এলেও বলার কিছু ছিল না । কিন্তু সরসী তা করেনি । সে বুঝেছিল এই মানুষটির সাথে আগেকার যতিকিশোরের অনেক পার্থক্য । মমতার নিবিড়তা দিয়েই সরসী গ্রহণ করেছে যতিকিশোরকে । শেরপুরের মাটিতে যতিকিশোর বর্জন করেছিল সরসীকে । এখানেই সে বুঝতে পারল—বর্জনে নয়, গ্রহণেই সুখ । পড়ন্ত বিকেলে সূর্যের শেষ রশ্মিতে দুটি সত্তা অতীতের দুঃস্বপ্নকে ভুলে যেতে চেয়েছে । চেয়েছে সুখহীনতার যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতে । অবশেষে আমাদের সামনে রচিত হয়েছে মুগ্ধতার এক মোহময় আবেশ বিসর্জিত সেখানে যাবতীয় গ্লানি ও বিষাদ । এই ভাবেই বিধৌত হোক সমস্ত মালিন্য । অনেক দেরি হয়ে গেছে, ক্ষতিও অনেক । আর নয় ।

সমস্যা-সঙ্কটে বিধ্বস্ত সময় এবং আঘাত-উৎক-ঠায় বিপর্যস্ত মানুষের ছবি 'কালের নায়ক' উপন্যাসে মুখ্য হয়ে উঠেছে। মানবিক সম্পর্কের অসুখকে চিহ্নিত করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই ঔপন্যাসিকের নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিবিম্বিত হয়েছে যুগযন্ত্রণার ছায়া। উপন্যাসটি প্রথম (১৩৮৩) ও দ্বিতীয় (১৩৮৮) —এই দুই পর্বে সম্পূর্ণ। একটি পরিপূর্ণ সংসার কী-ভাবে সর্বনাশের দিকে এগিয়ে গেল — সেটাই কাহিনীর উপজীব্য বিষয়। শারীরিক ও মানসিক অসুখ, সংশয়-ক্লান্তি, নিঃসঙ্গতাবোধ, মানবিক সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতা —এই সব কিছুই উপন্যাস-পরিবেশকে বেদনাচ্ছন্ন করে তুলেছে। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালে লেখা উপন্যাসটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে সমালোচকের মনে হয়েছে — সমগোত্রীয় পূর্ববর্তী উপন্যাসের তুলনায় এই উপন্যাসে "এই মধ্যবিত্ত সমাজভুক্ত মানুষ আরও নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, হৃদয়হীন হয়েছে; তাদের নিঃসহায় একাকিত্ব আরও ভয়ংকর হয়েছে, তাদের অধোগতি আরও অপ্রতিরোধ্য হয়েছে"।

কাহিনীর বিশেষ উল্লেখ্য চরিত্র হল সতীন, মহীন ও রথীন —এই তিন ভাই, — তাদের বোন কাজল, এবং রথীনের স্ত্রী নন্দা। এ ছাড়া জগ-ময় বা জগা, সুলেখা এবং কৃষ্ণাও উপন্যাসের মধ্যে বিশেষ তাৎপর্যবাহী চরিত্র হিসাবে স্বীকৃতি-যোগ্য। অসুস্থ বিনয়ভূষণের জীবদ্দশাতে যে-সংসারটা কোনওরকমে খাড়া হয়ে ছিল, মৃত্যুর পর-পরই সেটা একেবারে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। বড়ভাই রথীন এবং তার স্ত্রী নন্দার স্বার্থপরতা শুধুমাত্র সতীন, মহীন এবং কাজলকেই বিচলিত করেনি; একই সঙ্গে আমাদের চোখের সামনে একটা বিশাল পর্দাকে মেলে ধরেছে—যেখানে অন্ধকার এবং অন্ধকার। রথীনের লোভ এবং আখের গুছিয়ে নেওয়ার বাসনায় স্ত্রী নন্দা নিতান্তই ক্রীড়নক। কোনও-কোনও সময়ে সামান্য প্রতিবাদ বা মৃদু আক্ষেপ হয়তো সে করেছে— কি-ন্তু তাতে রথীনের বি-দুমাত্র যায় আসে না। মহীন স্বার্থপর নয় ঠিকই, কি-ন্তু তার মধ্যে বলিষ্ঠতার বড় অভাব। সংসারের প্রতি তার অমনোযোগ (যা আত্মমগ্নতার পরিনাম) তাদের পারিবারিক ফয়কে ত্বরান্বিত করেছে। এ-ছাড়া সুলেখার প্রতি তার দ্বিধাগ্রস্ততার মধ্যেও সাবলীলতাহীন মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ছোট ভাই সতীন বেকার। বড় নিঃসঙ্গ সে। সতীন বাধ্য হয়েই কৃষ্ণার কাছে কাজ করেছে —টাকা নিয়েছে, কি-ন্তু মনের দিক থেকে সায় পায়নি কোনওদিন। কৃষ্ণার মা মারা যাওয়ার

পর গানুড়ি যাওয়ার প্রস্তাবে সে যেভাবে পিছিয়ে এসেছে —তা কিছুটা অপ্রত্যাশিত। স্বাধীনতাহীনতার প্রসঙ্গ সতীন তুলেছে ঠিকই; কিন্তু তার চারিত্রিক তীক্ষ্ণতার সঙ্গে এই আচরণের সামঞ্জস্য আছে কি? অবশ্য কাহিনীর অন্তিম পর্যায়ে সতীন সক্রিয় হয়ে উঠেছে এবং বড় ভাইয়ের কুৎসিত আচরণে প্রতিবাদ করেছে। উপন্যাসের মধ্যে জগন্ময়ের প্রতি আকর্ষিত না হয়ে পারা যায় না। সে সতীনের বন্ধু। প্রতিকূলতার মধ্যেও বেঁচে থাকা যায় —এই বিশ্বাসকে বুকের মধ্যে জিইয়ে রেখে সে এগিয়ে যেতে চেয়েছে। তার চওড়া বুকের সঙ্গে মস্ত হৃদয় প্রকৃতই মানানসই। কাহিনীর মধ্যে লক্ষিত হয় সুলেখা ও কৃষ্ণা—দু'জনেই ক্লান্ত এবং অসুস্থ —শারীরিক ও মানসিক দুটি দিক থেকেই। তবে তাদের পরিণতির মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। সুলেখা তার অসুখের মধ্যেও যা হোক কিছু আঁকড়ে ধরে পরিপূর্ণ নিঃশ্বাস নিতে চেয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণা আঘাতে-আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত। সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা তারও কিছু কম ছিল না; কিন্তু অসুস্থতা—অসহায়তা—হতাশা—একাকিত্ব তাকে —তার ভাবনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে।

বিনয়ভূষণ যে ক্যানসারে আক্রান্ত তা প্রথম পর্বের গোড়ার দিকেই লক্ষ্য করা যায়। 'সতীন নিজে অসুখ -বিসুখের ব্যাপার কিছু বোঝে না। তার বাবার গলা ব্যথা, খাওয়ার কষ্ট, এমন কি শ্বাসকষ্ট যে কি ধরনের ব্যাধি সে জানে না। কিন্তু ডাক্তার দেখানোর ব্যাপারে বড়দার আচরণ তার ভাল লাগে না।

> বাবা বুড়ো মানুষ, তার দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, যতই বাবার দিন শেষ হয়ে আসছে ততই বড়দা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক আলগা করে ফেলছে। যেটুকু কর্তব্য, যা করা উচিত, না করলে বিবেকে লাগবে, দৃষ্টিকটু দেখাবে বা মনে হবে বাবার ওপর বড়দার কোনো কৃতজ্ঞতা নেই—বড়দা কি সেইটুকুই মাত্র করতে চায়।

সতীন বেকার। অক্ষমতা এবং পরাধীনতার গ্লানি তার কাছে দুঃসহ ঠেকে। একমাত্র বোন ছাড়া বাড়িতে কেউ তাকে পাত্তা দেয় না। জগন্ময়ের মত ট্যাকসি চালিয়ে নিজের খরচাটা চালিয়ে নিতে পারলে সমস্যা থেকে সম্ভবত মুক্তি পাওয়া যেত।

যেকি মান-সম্মান নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ ? কাজলকে সে বলেছে, —

"...চাকরিবাকরির বাজার খারাপ, হাজার হাজার লোক বেকার। এ বেটা গভর্ণমেন্টের বাবাও কিছু করতে পারবে না, বড় বড় কথা বলবে। কাঁহাতক বসে থাকব। কত লোককে বলেছি। কোথায় চাকরি। বাড়িতে আর প্রেস্টিজ থাকছে না খুকি। বড়দা সেদিন কী বলল শুনলি তো—বলল, ইফ দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে.....। আমার চাড় নেই, গরজ নেই —এটা আমার বড়দাবাবু বেশ ধরে নিয়েছেন। বউদি তো রেগুলার আমায় সাসপেকট করে, ভাবে বাবার কাছ থেকে টাকা-ফাকা হাতাই। .....কী অবস্থা বল্!'

কাজল আর সতীন—এই দুই ভাই-বোন সারা বাড়িতে একমাত্র ব্যতিক্রম যারা নিবিড় অন্তরঙ্গতা দিয়ে নিজেদের ঘেরে রেখেছে। দু'জনেই দু'জনকে সুখ-দুঃখের কথা শোনায়। কাজল যে আর্ট কলেজের বাচ্চুকে পছন্দ করে তা সতীনের অজানা নয়। সতীন হঠাৎ-ই এ-প্রসঙ্গে কাজলকে যা বলেছে শুনতে খারাপ লাগলেও তার মধ্যে বাস্তবেরই প্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে।

সতীন আচমকা বলল, "খুকি, তোকে একটা অ্যাডভাইস দি। আমাদের এক ব-ধু, এক বছরের সিনিয়ার, বোধন মজুমদার, কবিতা-টবিতা লিখত। তার পদ্য কাগজে ছাপা হত, বুঝলি। বেটা কবিতা কবিতা করে মরত, কফি হাউসে মাছির মতন বসে থাকত সারাদিন। সেই বোধন আজকাল মশামারা ধূপের ক্যানভাস করে বেড়ায়। পোয়ট্রি-ফোয়ট্রি কেউ কেয়ার করে

না বুঝলি ? ছবি এঁকে পদ্য লিখে কিছু হবে না ।
কোন শালা আদর করে জামাই করবে না রে ।
আজকাল লোকে অন্য জিনিস চায়, হয় বিজনেস, ব্ল্যাক
মানি ; না হয় ঘুষের চাকরি ....।'

রথীন বুঝতে পেরেছে তার বাবার আয়ু ক্রমশই সীমিত হয়ে আসছে ; সুতরাং সময় থাকতে-থাকতে ভবিষ্যতের জন্যে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে তার । সে নেক টাউনে জমি কিনতে আগ্রহী । এমন কী পৈতৃক বাড়িতে নিজের অংশ বেচে দেবার ইচ্ছাও তার আছে । নন্দা স্বামীর কথা ঠিকমত ধরতে পারেনি, পরে সবকিছু বুঝতে পেরেছে ।

নন্দা স্বামীর মনের কথা বুঝতে পারছিল ।
না পারার কিছু নেই । বাস্তবিক এই বাড়ির
তো ওই রকমই হাল হবে ভবিষ্যতে । তিন
ভাই, তাদের বউ বাচ্চা, সবাই চাইবে
এ-বাড়িতে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকতে, অশান্তি
বাড়বে, ঝগড়াঝাঁটি হবে, আর রথীন যেহেতু
বড় ভাই তার মাথার প্রথম থেকেই যত দায়—
দুশ্চিন্তার ভার চাপবে ।

রথীনের এই মনোভাব —নন্দার সমর্থন, স্বার্থপরতার চূড়ান্ত মাত্রাকে স্পর্শ করেছে । রথীন যে বড়-ভাই এবং প্রতিষ্ঠিত —এ চিন্তাকে সে আমল দেয়নি । অন্যথায় বুঝতে পারত তাদের পরিবারের চাকাটা সচল রাখার জন্যে তার দায়িত্ব অপরিসীম —যা সে কোনওদিন পালন করার চেষ্টা করেনি ; যতটুকু করেছে —তা লোক দেখানো এবং দায়-সারা । রথীনের বিশ্বাস তার একার ঘাড়েই সংসারের সমস্ত ভার চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে । মহীন কলেজের লেকচারার, তার হাব-ভাব বড়-ভাইয়ের একেবারেই পছন্দ নয় । আর মহীনের চোখে ছোট সতীন রীতিমতন এক অপদার্থ । ছোটবোন কাজলের বিয়ে এখনও বাকি । রথীন কিন্তু ও-সব ব্যাপার নিয়ে মোটেই আগ্রহী নয় । সে চিন্তা করেছে —বাবার জীবদ্দশায় কাজলের বিয়ে হলে আর দেখতে হবে না ; সমস্ত ঝামেলার ভূতটাই তার কাঁধে চেপে বসবে । বাবা মারা

যাওয়ার পর কিছুটা রেহাই অন্তত পাওয়া যাবে । তখন মেজভাই মহীনকে যাবতীয় খরচাপাতির অর্ধেক দায়িত্বের জন্যে বলতে অসুবিধা ঘটবে না । রথীন এখন থেকেই তাই পরিকল্পনামাফিক সতর্কতা নিয়ে এগিয়ে যেতে চায় । তারই অঙ্গ হিসাবে সময় থাকতে-থাকতে শুরু হয়ে গেছে সব কিছু গুছিয়ে নেওয়ার নিঃসাড় এবং চতুর প্রস্তুতি ।

সুলেখার সঙ্গে মহীনের পরিচয় মফস্বলের মথুরামোহন কলেজে পড়াতে গিয়ে ।

> সুলেখা সে মফস্বল কলেজে তার সহকর্মী ছিল । বাংলা পড়াত । সুলেখা বিবাহিতা । ধর্ম ক্রীশ্চান । মেরুদণ্ডের কি একটা রোগে তাকে অনেকদিন বাড়ি আর হাসপাতাল করতে হয়েছে । গায়ের রঙ কালচে । কিন্তু মুখশ্রী এবং গড়ন অপরূপ । সুলেখার স্বামী রাজনীতি করেন, বরাবরই নাকি তাই করে আসছেন, অন্য কোনো পেশা তাঁর নেই, স্ত্রীর উপার্জনে সংসার চলে । আর যৎসামান্য কিছু জমিজমা আছে । কৃষ্ণপদ-বাবু যে মানুষটি খারাপ তা নন, তবে মফস্বলের নোংরা রাজনীতিতে তিনি মাথা পর্যন্ত ডুবিয়ে এখন পুরোপুরি পলিটিক্যালম্যান হয়ে গেছেন, রাজনীতি ছাড়া তাঁর অন্য কোনো ব্যাপারে নজর নেই, গ্রাহ্য নেই । স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কটিও পোষাকী । কোনো সন্দেহ নেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক অস্বাভাবিক —তাতে কোনো লাভ কারও পক্ষে হয় না । সুলেখার জীবনে যে অশান্তি সারাক্ষণ তাকে জ্বালাচ্ছে মহীন—সে অশান্তির কথা জানে । সুলেখাই বলেছে ।

সুলেখা মহীনকে বিশ্বাস করে তার দাহ জুড়াতে চায় । তাকে নির্ভর করে সে চায় জীবনকে ছন্দোময় করে তুলতে । সুলেখাকে নিয়ে মহীনও চিন্তাভাবনা করেছে,

কি-তু কিছুতেই সে বুঝে উঠতে পারে না —শেষ পর্যন্ত সে কতটা—কী করতে পারবে । পারিপার্শ্বিক তাকে দ্বিধাগ্রস্ত এবং হতাশ করে তুলেছে ; যদিও সুলেখার জন্যে সহানুভূতি ও মমত্ববোধ থেকে কোনও সময়েই সে সরে আসেনি ।

জগ-ময়ের মুখ থেকে সতীন তার সম্বন্ধে যে-টুকু জেনেছে —তাতে বোঝা গেছে জগ-ময়ের রাস্তাটা কোনওদিনই ঝকমকে ছিল না । জেল—বারকতক মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসা —কিছু বাদ যায়নি তার । ব-ধুর মুখ থেকে সতীন জানতে পেরেছে জগা জন্মাবার বছর তিনেক বাদেই তার বাবা মারা যান । কারখানায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল তার । জগ-ময়ের মা পরে আবার বিয়ে করেন । ছেলের জন্যে অবশ্য প্রচুর টাকা খরচ করতেন তিনি ।

> যাই হোক , টাকা নেওয়া ছাড়া জগার সঙ্গে তার মার সম্পর্ক তেমন ভাল ছিল না । জগা ছুটি-ছাটায় মার কাছে কমই যেত । যখনই যেত , দেখত তার পালিত পিতা মদ্যপান করছে , মা মদ খাচ্ছে ; দুই মাতালে চেঁচা-মেচি করছে , হাতাহাতিও লেগে যেত এক এক সময় নেশার ঘোরে । সেই বাপ মরে গেল । মানে মার্ডার হল । আর মা ? মা'র কথা জগ-ময় বিস্তারিত করে আর বলল না ; তবে সেই মা বেঁচে আছে এমন মনে করারও কোন ইঙ্গিত ছিল না ।

সতীনের সঙ্গে কৃষ্ণার হঠাৎ-ই দেখা হয়ে গেছে কালীবাবার আশ্রমে । ওখানে সতীন তার বাবার জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছিল । কৃষ্ণা সতীনের কলেজের ব-ধু দিলীপের দিদি । তার মুখ থেকে দিলীপের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সতীন চমকে উঠেছে । মারা যাবার কারণ জিগ্যেস করায় কৃষ্ণা বলেছে :

> "ওর তো মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল । হাসপাতালে রাখবার চেষ্টা করেছিলাম , থাকতে চাইত না । বার-দুই রাখলাম ।

আবার নিয়ে এলাম । যার জন্যে রাখা যেত না ।"
বলতে বলতে একটু থামল কৃষ্ণা, যেন ভাইয়ের
স্মৃতি তাকে হঠাৎ চুপ করিয়ে দিল । সামান্য
পরে বলল, "বাড়িতেই থাকত, মাঝে মাঝে
রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াত । একদিন কোথায় যাচ্ছিল
জানি না, বাস চাপা পড়ে মারা গেল ।"

কৃষ্ণার মা-ও বদ্ধ পাগল । তার জন্যেই কৃষ্ণা কালীবাবার আশ্রমে এসেছে । এমনি সে এ-সবে বিশ্বাস করে না । কথা বলার সময় সতীন কৃষ্ণার চোখে-মুখে স্পষ্টতই সুস্থিহীনতার ছাপ লক্ষ্য করে । মনে হয় সে অসুস্থ । কৃষ্ণা জানিয়েছে, "আমার এ-রকম হয়, মাথা ঘুরে যায়, ভীষণ টনটন করে । তাকাতেও আর ইচ্ছে করে না । বমি-বমিও লাগে । ওষুধ আছে সঙ্গে, খেয়ে নোব ।" কৃষ্ণা ট্যাকসিতে করে সতীনকে তার বাড়ির সামনে নামিয়ে দেয় । এ-ছাড়া অপ্রত্যাশিত ভাবেই কৃষ্ণার কাছ থেকে যা-হোক একটা চাকরির আশ্বাসও সে পায় । সতীন বুঝতে পারে কৃষ্ণার অনেক টাকাকড়ি । তবু এই অযাচিত আশ্বাসে সে বিস্মিত না হয়ে পারে না । তার মনে হয় —এতক্ষণ ধরে একটা পাগলা মেয়ের খপ্পরে পড়ে ছিল সে ।

সুলেখা মথুরামোহন ছেড়ে কলকাতার কলেজে চলে আসতে চেয়েছে । মহিমের মনে হয় —সুলেখা এটা ঠিক করছে না । তার অসুস্থ শরীর । কলকাতার দূষিত জল-হাওয়া সে সহ্য করবে কী করে ? সুলেখা কি-তু স্পষ্টতই তাকে জানিয়েছে — বাঁচার শর্ত শুধু দূষণ-মুক্ত জল-হাওয়াতেই নয় —আরও অন্য কিছু ।

"শুধু জলহাওয়ায় মানুষ বাঁচে ?" সুলেখা বাধা
দিয়ে বলল । মহীন কেমন থতমত খেয়ে গেল ।
বলল, তোমার কথা বুঝলাম না ।" "বলছি শুধু
জল-হাওয়ায় মানুষ বাঁচে ?" না বোঝার কিছু
নয়, মহীন বুঝেছিল, বুঝেও এড়িয়ে যাবার
চেষ্টা করেছিল । বলল, "তা বলছি না ।
তবে তোমার শরীরের জন্যে আগেরটাই ভাল ছিল ।"

"আর মনের জন্যে ?" সুলেখা ছোট করে বলল। এবার তার গলার সুরে চাপা ক্ষোভ।

আসলে সুলেখা আর কৃষ্ণপদর সঙ্গে থেকে মিথ্যা সম্পর্ককে প্রশ্রয় দিতে চায় না। সে ডিভোর্স নিতে চেয়েছে। কৃষ্ণপদ অবশ্য তাতে রাজি আছে। ও-ভাবে বেঁচে থেকে লাভ নাই, কলকাতায় এসে সুলেখা নতুনভাবে জীবনের অর্থ খুঁজে নিতে চায়। মহীনের উপর তার অগাধ আস্থা। কি-তু মজার কথা হল মহীন তার নিজের উপরেই ভরসা করতে পারে না। সে কীভাবে ভরসা জোগাবে সুলেখাকে —কিছুতেই ভেবে উঠতে পারে না।

মহীনের দুঃখই হচ্ছিল। সুলেখার জন্যে এবং নিজের জন্যেও।

* * * * *

তেলপোড়ায় অবিশ্বাস দেখানো যায়, মহীন দেখাতে পেরেছে। অথচ তার সাহস নেই, বাড়ির লোক যে সমস্ত সংস্কার, ধারণা নিয়ে রয়েছে তাকে উপেক্ষা করে সুলেখাকে একটা দিনের জন্যেও এ-বাড়িতে এনে রাখা।

মহীন বিরক্ত বোধ করল। হতাশ বোধ করল। যে মেয়েকে সে সৌজন্য বশেও স্বেচ্ছায় দু'একদিনের জন্যেও নিজের বাড়িতে এনে রাখতে পারে না — সে আজীবন কেমন করে তার সহায়-সম্বল হতে পারে। মাথা নেড়ে অন্ধকারে মহীন নিজেকেই গালাগালি দিল।

অবশেষে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন বিনয়ভূষণ। 'সবই আছে শুধু বাবাই আর নেই। আজ ভোরের দিকে চলে গেল। শেষ সময় কাউকেই আর বিব্রত করল না। হুড়োহুড়ি করতে দিল না।' বাবার মৃত্যুর পর বড়দার কাণ্ড-কারবার দেখে সতীন অবাক না হয়ে পারছিল না। কান্নাকাটি, চিৎকার বুক চাপড়ানো —প্রায় কিছুই আর বাকি ছিল না। তারই ভিতরে বউদি বাবার দেরাজের চাবিটা

নিজের কাছে রেখে দিয়েছে, ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেল। বেঁচে থাকার সময় বাবার প্রতি যার আচরণ ছিল নিতান্তই দায়সারা; সেই লোকই আজ শোকে ব্যাকুল। ব্যাপারটা যে রীতিমতন নাটকীয় এবং তাৎপর্যপূর্ণ — সে কথা বুঝতে অসুবিধা ঘটে না। শ্মশান থেকে ফিরে আসার সময় নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হচ্ছিল সতীনের। এক অদ্ভুত শূন্যতা তাকে গ্রাস করছিল।

> তাহলে দেখা যাচ্ছে এ-বাড়ির সবই ভেঙে গেল। দিদি অনেক আগেই পরের বাড়িতে চলে গেছে; মা মারা গিয়েছে বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। বাবা ছিল বাবাও চলে গেল। বড়দা নিজে বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে অন্য জায়গায় চলে যাবে, আজ কিংবা কাল। মেজদাও যে দিকে পা বাড়িয়েছে তাতে তাকেও আর ধরে রাখা যাবে না। থাকার মধ্যে খুকি আর সতীন। খুকিরও বিয়ে হয়ে যাবে যেমন করে হোক। তাহলে এক সতীনই থাকল।

নিজের উপর ঘৃণা হচ্ছিল সতীনের। সে কোনওদিনই যোগ্য হয়ে উঠতে পারল না। বাবার সঙ্গে তার দূরত্বটা রয়েই গেল। চেষ্টা করলেও কোনওদিন সেটা দূর করা গেল না। অসহায়তা আর নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা সতীনকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। তার দু'চোখে জলের ধারা।

'কালের নায়ক' উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্বের মধ্যেও অসুখের কালো ছায়া ক্রমবিস্তারী। বিনয়ভূষণের মৃত্যুর পর মাত্র কিছুদিন কেটেছে, এরই মধ্যে রথীন আর মহীনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়ে গেল। সতীন ঝগড়ার কারণটা আঁচ করতে পারে :

> সতীন সেই দিনই প্রথম বুঝল, বড়দা বাবার কিছু টাকা বুদ্ধি করে সরিয়ে নিয়েছিল এবং টাকাটা জমি কেনায় খরচ করেছে। কিংবা

কোথাও আড়াল করে রেখেছে । আর ওই
চেঁচামেচির মধ্যে বড়দা স্পষ্ট করেই বলে
দিল , এই বাড়িটা বেচে ফেলা হোক । যে
যার প্রাপ্য বুঝে নিক , বড়দা এ বাড়িতে আর
থাকবে না । এই বাড়িতে কোনও ভদ্রলোক বাস
করতে পারে না । বস্তি-বাড়ির মতন হয়ে গেছে
সব ।

সতীন শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণার কাছেই কাজ করার জন্যে রাজি হয়েছে । আপাতত কাজটা হল তাদের এস্টেট দেখা-শোনা করা । ভরসাতে আছে , পরে হয়তো অন্য কোথাও কৃষ্ণা তাকে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে । ছোট বোন কাজল কি-তু এই ব্যাপারে খুশি নয় । —তুমি ভদ্রলোকের ছেলে , কোথাকার একটা পাগলী , হোক না সে বড়লোক , তোমায় তার বাড়ির চাকরবাকর করে রাখবে ! তুমি আবার মুখ ফুটে সেকথা বলতে এসেছ ! সতীনের জবাবে তিক্ত-তা অপ্রকাশিত নয় । তাকে সবাই গলগ্রহ বলে ভেবে এসেছে , কেউ-ই কিছু করল না —সম্ভবত করবেও না ; এই পরিস্থিতিতে ফালতু মান-সম্মান নিয়ে মাথা ঘামানোর কী দরকার ।

''তোরা লোককে বড় অবিশ্বাস করিস—''
ক্ষুব্ধ আহত গলায় বলল সতীন । আজকাল
কেউ কারুর হয়ে করতে চায় না । এভরিওয়ান
ইজ সেলফিশ । আমার দাদারা আমার জন্যে
কী করেছে রে ? ওদের প্রেস্টিজে লাগে ।

সতীনকে কৃষ্ণাদের ওখানে নিয়মিত যাতায়াত করতে হয় । একদিন সতীনের কাছে কৃষ্ণা ভেঙে পড়ল । কোনও কিছুর অভাব নাই ; তবু সতীনের মনে হল কৃষ্ণা বড় অসহায় —বেদনায় ম্লান ।

''আমি আর পারি না—''কৃষ্ণা হঠাৎ বলল ,
হতাশ ভাঙা গলায় , নরম বেদনায় । নিঃশ্বাস
ফেলল বড় করে । ''কী হবে বল এই যজ্ঞের পুরীতে

বসে । ছোট ভাই গেল, মা যাবে আমিও যাব ।
কী হবে এই ঘর, এই বাড়ি, এই মিথ্যে মিথ্যে
বেঁচে থাকার ? কেন বেঁচে থাকব ? কোন্ লাভ
আমাদের বেঁচে থাকার ?" বলতে বলতে কৃষ্ণা
থেমে গেল । তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলন থরথর
করে । ফুলে উঠল, দুমড়ে যাচ্ছিল যেন । তারপর
ছেলেমানুষের মতন কেঁদে ফেলন ।

কৃষ্ণার মা এখন পুরোপুরি উন্মাদ । সংসারের কোন খবরেই তাঁর প্রয়োজন নাই । তিনি তিনতলাতে থাকেন । তাঁর জন্যে আলাদা লোক রয়েছে । 'তেতলায় এক-একদিন হঠাৎ যেন ঝড় ওঠে । কী যে হয় বোঝা যায় না নীচে থেকে, শুধু বাসনকোশন ভাঙার, দরজা-জানলা ব-ধ হবার, দাপাদাপির কিছু শব্দ ভেসে আসে ! সব কিছু দেখে শুনে সতীন অবাক হয় । তার মনে হয় এই বাড়ি আর মানুষজনের মধ্যে স্বাভাবিক জীবনের কোনও স্প-দন নাই । সবই অদ্ভুত ।

এ-দিকে রথীনের কাজ-কারবার—তার উচ্চাশা এমন-ই স্তরে পৌঁছে গিয়েছে — যে ন-দা পর্যন্ত বিরক্ত না হয়ে পারছিল না । তার মনোভাব এত তাড়াহুড়োর কী আছে ? আসলে ন-দাকেই সব ব্যাপারে খোঁটা হজম করতে হচ্ছিল । রথীনের কি-তু ও-সব ভাবার সময় নাই । তার মগজে এখন শুধু কেরিয়ার তৈরির উচ্চাকাঙ্ক্ষা । একটা সময় ন-দার বিরক্তি আর ওই শব্দটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, রূপ পেয়েছে গভীর হাহাকারে । 'ন-দা লক্ষ্য করে দেখেছে, রথীন যত দিন যাচ্ছে ততই কেমন পালটে যাচ্ছে ! একটা সময় সংসারে 'শান্তি ছিল, সুখ ছিল । এখন শুধু অশান্তি । রথীন কেন যে হঠাৎ ঘোড়ায় জিন দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে তাও ন-দা বুঝতে পারে না ! ফেলে আসা জীবনের কিছু মাধুর্য এখনও ন-দার স্মৃতিতে জেগে আছে । কি-তু বর্তমানের এই কুৎসিত পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে শিউরে উঠতে হয়েছে তাকে । বাকি দিনগুলি কীভাবে কাটবে —সে ভেবে পায় না ।

ন-দার হঠাৎ স্বামীর ওপর কেমন ঘৃণা আর
বিদ্বেষ জাগল । মানুষটার সমস্ত কিছু হিসেব-
কষা, যেন অঙ্ক মিলিয়ে সব ছকে রেখেছে,

কবে জমি কিনবে, কেমন করে টাকা জোটাবে,
কবে প্ল্যান করবে বাড়ির, কোন ফাঁকে লুকিয়ে
চুরিয়ে ভিতপুজো করে নেবে ....।
এত চালাক, হিসেবী মানুষ নিয়ে নন্দাকে সারা-
জীবন চলতে হবে। আর ওই মানুষের আধিপত্য,
মেজাজ, গালমন্দ সহ্য করতে হবে আজীবন।

সতীন কৃষ্ণার মুখ থেকে তার মায়ের মৃত্যুসংবাদ শুনে চমকে উঠেছে। শেষ রাতে মরে পড়েছিলেন বাগানের সিঁড়ির কাছে। গালুডিতে পৌঁছানোর পর তাকে দাহ করা হবে। কৃষ্ণা সতীনকে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে বলে। কি-তু সতীনের নানা অসুবিধা। কৃষ্ণার মত স্বাধীনতা সে কোনওদিনই পায়নি। কৃষ্ণা কি-তু সেই মুহূর্তে কোনও ওজর শুনতে রাজি নয়। তার কথাতে ঔদ্ধত্যের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সতীন কৃষ্ণার এই রকম ব্যবহার বরদাস্ত করতে পারে না, সে প্রতিবাদ জানায়। উত্তেজিত কৃষ্ণাও চরম অপমান করে সতীনকে।

"তুমি আমায় তেজ দেখাচ্ছ! তোমার তেজে
আমি থুতু ফেলি। কোথায় ছিল তোমার এই
তেজ এতদিন! সম্মান —! তোমার সম্মান!
আমার হাত থেকে টাকা নেবার সময় তোমার
সম্মানে বাধত না? আজ তোমার সম্মানে
লাগল! অকৃতজ্ঞ, জানোয়ার কোথাকার! যাও,
তুমি বেরিয়ে যাও আমার বাড়ি থেকে। আর
কোনোদিন এবাড়িতে ঢুকবে না।"

কৃষ্ণা মৃতা মায়ের জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল। সতীনের অসম্মতিতে সে নিজেকে সামলাতে পারেনি। যে সতীনকে একদিন সে উপযাচিকা হয়েই সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল; তাকেই আবার নিষ্ঠুরের মতন তাড়িয়ে দিল বাড়ি থেকে।

কলকাতায় চলে আসার পর সুলেখার যেন নব-জন্ম হয়েছে। তার শরীর ও মন এখন বেশ সতেজ। এখন সুলেখাকে দেখলে কেউ বুঝতে পারবে না যে, এই

মেয়েটিই একদিন কঠিন ব্যাধির শিকার হয়েছিল । মহীন যতই সঙ্কোচের কথা ভাবুক না কেন –শেষ পর্যন্ত তার মনেও আলোড়ন জেগে উঠেছিল । সুলেখাকে যদি সে গ্রহণ করতে চায়—তাহলে সমাজ কেন তার পথ রোধ করবে —বাধার প্রাচীর তুলবে কী অধিকার আছে তার ? কলেজে বদনামের ভয়ও সে করে না । ওখানে অনেকেরই চরিত্রের খোঁজ সে রাখে । আর তার বাড়ি ? 'মহীন আজকাল বেশ বুঝতে পারছে , একসময় তাদের বাড়ি বলতে , পরিবার বলতে যা বোঝাত --এখন আর তা বোঝায় না । সবাই আছে এখনও , বাবা ছাড়া , কিন্তু ওই নামেই থাকা —নিতান্তই রক্তের সম্পর্ক বলে একটা সম্বন্ধ থাকা , তার বেশী কিছু নয় !—সুতরাং মহীনের কুণ্ঠিত হওয়ার কারণ থাকতে পারে না ।

সতীনের সঙ্গে হঠাৎই একদিন কৃষ্ণাদের সরকারবাবুর দেখা হয়ে গেছে । তার মুখ থেকেই সে মারাত্মক খবরটা শুনল । কৃষ্ণা ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরতে যাচ্ছিল । খবরটা শুনে সে চমকে উঠেছে ।

> কৃষ্ণা ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে
> গিয়েছিল । কেন ? কোথায় তার দুঃখ ?
> ঘরবাড়ি , টাকাপয়সা , দাসদাসী –কোথাও
> যার অভাব নেই –কেন সে মরতে চায় !
> কিসের অভাবে ? মাতৃবিয়োগ তার পক্ষে কি
> অসহ্য হয়ে উঠেছে ? নাকি এই শূন্যতা আর
> সহ্য করার ক্ষমতা নেই !

সতীন কৃষ্ণাকে দেখতে গিয়েছিল । কিন্তু কৃষ্ণার তখন প্যারালিসিস হয়ে গেছে । সতীন সেই মর্মান্তিক দৃশ্যের কথা কাজলের কাছে বলতে গিয়ে প্রায় কেঁদে ফেলেছে ।

> অনেকক্ষণ নীচে বসে ওপরে কৃষ্ণার ঘরে গেলাম ।
> সরকারবাবু বললেন ।....কৃষ্ণা বিছানায় শুয়ে ছিল ।
> কোমর পর্যন্ত চাদর ঢাকা । আমি ঘরে ঢুকতেই
> কৃষ্ণা আমায় একটু দেখল । তারপর বিচ্ছিরিভাবে
> হাত নেড়ে আমায় চলে যেতে বলল ; তাড়িয়ে দিল ।

একটা কথাও বলল না।" সতীনের মুখ
শক্ত, আরও থমথমে, কালচে হয়ে
উঠল, গলার পুঁটলিটা কাঁপছিল। মনে
হচ্ছিল সে বোধহয় কেঁদে ফেলবে।

জগ-ময়ের সঙ্গে কাজলের সম্পর্ক এখন বেশ সহজ-সরল। জগ-ময় কাজলের জন্যে অনেক কিছুই করেছে। ধরাধরি করে সমবায় সমিতির দোকানে তাকে সেলসগার্লের একটা চাকরিও জুটিয়ে দিয়েছে। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই কাজল হাঁফিয়ে উঠছিল। বড়দা-বৌদি তার প্রতি মোটেই সদয় নয়। মেজদা মহীন থাকে তার নিজস্ব জগতে। ছোড়দা সতীনের সঙ্গেই ছোটবোনের মত অন্তরঙ্গতা। কাজল বাবুকে ভালবেসেছিল। কি-ন্তু সে তো এখন গ্ল্যামারের পিছন-পিছন ছুট-ত; কাজলের দিকে তাকানোর সময় কোথায় তার? এই দুর্বিসহ পরিস্থিতিতে সরল অথচ শক্ত মানুষ জগ-ময়ের ব্যবহার কাজলকে মুগ্ধ করে। সামান্য ট্যাকসি চালকের মধ্যে এরকম সৌজন্য আশাই করা যায় না। ওরা এখন ঘনিষ্ঠ এক বৃত্তের মধ্যে। এই বৃত্তে নিবিড়তার ছোঁয়া। কি-ন্তু সে-দিন তাদের বাড়িতে একটা ভয়ঙ্কর কা-ড ঘটে গেল। ন-দা এমনিতেই ফুঁসছিল। বিশেষ করে কাজল দিদি বাড়িতে থেকে চাকরি শুরু করার পর থেকে তুচ্ছ কারণে সেদিন ন-দা অপমান করে বসল কাজলকে। এমন-কী জগ-ময়কে জড়িয়ে আপত্তিকর কথাবার্তাতেও কু-ণ্ঠা বোধ করল না সে। কাজলও বেপরোয়া হয়ে বউদির মোকাবিলা করছিল। মুখের মত জবাব শুনে ন-দা আরও হিংস্র হয়ে উঠেছিল।

"কি বললে, বেশ করো —!" ন-দার গলা
বিশ্রী শোনাচ্ছিল।"নোংরা, অসভ্য মেয়ে
কোথাকার। তোমার লজ্জা বলল না বলতে।
বাড়ির বাইরে গিয়ে সবই বিসর্জন দিয়েছ,
না? তা না দিলে রাত্তিরে ওই ছোঁড়ার সঙ্গে
রিকশা করে ঢুকবে কেন? ...তোমার লজ্জা-
সরম না থাকতে পারে, আমাদের আছে।

আমার বাপের বাড়িতে গিয়ে যখন ভাইয়ের
মুখে এ সব কথা শুনি তখন আমার নিজেরই
গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।"

কাজল যেন ঠিক করেছিল আজ সে আর
সহ্য করবে না, হারবে না। এই ইতরোমির
শেষটুকু সে দেখে নেবে। বলল, "তোমার
ছোড়দার কত গুণ! মদ খেয়ে নেশা করে রাত্তিরে
মেয়েদের পেছনে লাগতে গিয়ে লাথি খায়।"

ন-দা জ্বলে যাচ্ছিল। এবার সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কাজলের উপর। চুলের মুঠি ধরে তাকে চড় কষায়। কাজল রুখে দাঁড়াল। দু'জনের মধ্যে শুরু হয়ে গেল ধাক্কা-ধাক্কির পালা। হঠাৎই রথীন ক্ষিপ্ত হয়ে কাজলকে টেনে নিয়ে এক লাথি কষায়। বলে,— "বেরিয়ে যাও তুমি —এই মুহূর্তে চলে যাও, এ-বাড়ি ছেড়ে। অসভ্যতা করার জায়গা পাও নি! এটা ছোটলোকের বাড়ি! চলে যাও তুমি। গেট আউট!"— সতীন আর সহ্য করতে পারল না। কাজলকে লাথি মারার কারণ কঠিন গলায় সে জিজ্ঞাসা করে রথীনকে।

ছোট ভাইয়ের এই ঔদ্ধত্য রথীন কল্পনাও
করেনি। আরও যেন জ্ঞানশূন্য হল। চিৎকার
করে বলল, "বেশ করেছি। আমি ওকে জুতো-
পেটা করে বাড়ি থেকে তাড়াব।" বলে রথীন টান
খেতে খেতে পায়ের একটা চটি খুলে হাতে নিল।
সতীন বলল, "তুমি ওকে জুতো-পেটা করে দেখ
কি হয়?"

"কী? কী বললি তুই! তুই আমায় চোখ রাঙাচ্ছিস?"
রথীন যেন সত্যিই দেখতে চাইল পরিণামটা কী হয়,
জুতো হাতে কাজলকে মারতে গেল। সতীন হাত ধরে
ফেলল রথীনের, রথীন বেহুঁশ, সতীনের মাথাতেও

রক্ত চড়ে গিয়েছে। দুই ভাইয়ের ঠেলাঠেলি,
একে অন্যের হাত মুচড়ে ধরছে, মাথা দিয়ে
ঠেলছে, পায়ে পা চেপে ধরছে, রথীন দুটো
ঘুঁষি মারল ছোট ভাইকে, সতীন নিজেকে
বাঁচাচ্ছিল।

মহীন সতীনকে ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। নন্দাও ডুকরে উঠে চেষ্টা করে স্বামীকে নিবৃত্ত করার। তার মনে হয়েছে — এ-ভাবে চললে স্বামীর রক্ত-চাপ বেড়ে যেতে পারে, তা-ছাড়া গুণ্ডা বদমাশের সঙ্গে পারা কী সম্ভব? রথীন কিন্তু অন্যরকম ভাবছিল। তার মনে হচ্ছিল —এ-ভাবে হেরে গেলে চলবে না। হেরে গেলে এতদিনকার প্রতিপত্তি, মর্যাদা সব নষ্ট হয়ে যাবে। সতীনের শরীরেও আজ কাঠিন্য। অনেক কিছুই নীরবে সহ্য করে এসেছে এতদিন। কিন্তু আজ তার মন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। যুদ্ধ থামেনি তখনও।

হাঁফাতে হাঁফাতে রথীন এবার সুযোগ পেয়ে
সতীনকে একটা লাথি মারল। উরুর কাছে
লেগেছিল সতীনের। বেশ জোরেই লেগেছিল।
আর এই প্রথম —বড় ভাইয়ের সঙ্গে লড়তে
লড়তে ক্লান্ত, আহত হয়ে সতীন তার সমস্ত
শক্তি দিয়ে একটা ঘুঁষি মারল। রথীনের
চোয়ালে লাগল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে
উঠল রথীন।

যুদ্ধ শেষ। রথীনকে টানতে-টানতে নিয়ে গেছে নন্দা। সতীন মাথা নীচু করে বসে, তার জামা ছিঁড়েছে। কাজলের গালে আঙুলের দাগ স্পষ্ট। মহীন নিঃশ্বাস ফেলে বলে পুজোর দিন কী যে হয়ে গেল, —'হয়ত এই রকমই হত'। সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বোঝার উপায় নাই কিছুক্ষণ আগেই সংঘটিত হয়ে গেছে কুরুক্ষেত্র-পর্বটি। যুদ্ধশেষের চরম বিষাদ যেন সতীনকে আকুল করে তুলেছিল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছিল সতীন।

কাজল কান্নার শব্দ শুনল। দাদা নুয়ে পড়ে,
বুক পেট হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে

ফুঁপিয়ে - ফুঁপিয়ে কাঁদছে । সেই কান্নার শব্দ
বড় অদ্ভুত শোনাচ্ছিল । নাক মুখ গলা বুক—
সমস্ত কিছু যেন উজাড় করে দিয়ে এই রকম
কান্না দাদাকে আর সে কাঁদতে দেখেনি ।

কাজলের সহসা মনে পড়ে গেল দাদা এইভাবে আকুল হয়ে আরও একবার কেঁদেছিল । বাবা চলে যাওয়ার পর । কাজলও নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না । কেঁদে উঠল সেও ।

দুই পর্বে সম্পূর্ণ উপন্যাসটির মধ্যে মানবিক সম্পর্কের জটিল অধ্যায়টি রূপ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক মারাত্মক সঙ্কটের যে পরিচয় বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে প্রতিফলিত করেছেন তাতে স্তম্ভিত না হওয়াটাই আশ্চর্য ! মানবিক সম্পর্কের অধঃপতন—একটি সংসারের ভগ্ন রূপ আমাদের বিমূঢ় করে তুলেছে । "আমাদের চেনাকাল ও পরিবেশ এখানে এত নিকটবর্তী ও স্পষ্ট যে আমরা তাকে ছুঁতে পারি । মধ্যবিত্তের অবলম্বনহীনতা, নিঃসঙ্গতা ও অসহায়তার চেতনাকে " নির্মোহ দৃষ্টিতে উপস্থাপিত করেছেন লেখক ।"[৪]

বড়ভাই রথীনের স্বার্থপর মানসিকতার জন্যেই মূলত যৌথ পরিবারটি তছনছ হয়ে গেছে । যুক্তির খাতিরে হয়তো প্রশ্ন উঠতে পারে একা রথীনের ঘাড়েই সব বোঝা চাপবে কেন ? (যা সব সময়েই সে মনে করে এসেছে) কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না সে অগ্রজ এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত । এ-ছাড়া তার আচরণে আত্ম-কেন্দ্রিকতার যে কদর্য রূপ এবং চাতুর্য দেখতে পাওয়া গেছে তা মহীন, সতীন ও কাজলের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিতে বাধ্য । স্ত্রীর নন্দা মাঝে-মধ্যে আপত্তি তুলেছে ঠিকই, কিন্তু তার মধ্যে দৃঢ়তা ছিল না । উপন্যাসের মধ্যে অবশ্য লক্ষ্য করা গেছে যন্ত্রণা নিয়েই সে অনুভব করার চেষ্টা করেছে পেছনে ফেলে আসা শত দিনগুলি, উপলব্ধি করতে চেয়েছে তার সুখ-স্মৃতির গাঢ়তাকে ।

মহীনের প্রতি রথীনের ঈর্ষা, সতীনের প্রতি অবজ্ঞা এবং কাজলকে বোঝা মনে করা—তার প্রতি দুর্ব্যবহার যৌথ পরিবারের ভিতকে টলিয়ে দিয়েছে । ভবিষ্যতের

ভাবনায় রঙীনের আগমন প্রস্তুতির মধ্যে নিষেধাজ্ঞা আরোপের কোনও প্রয়োজন থাকা উচিত নয়, মেনে নেওয়া গেল ; কি-তু ঘোরতর আপত্তি আছে —বিনয়-ভূষণের মৃত্যুর পর পরই সে যে-ভাবে নিজের আখের গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেছে —তাতে । জনশ্রুতি আছে বড়র উপর দিয়েই ঝড়টা নাকি বেশি করে বয় ; কি-তু এই বড়র জন্যেই একটি সংসারে যে-ভাবে দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠেছে—তা অভাবিত । মানবিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবমাননার যে-ছবি কাহিনীর শেষে আমরা দেখেছি, তাতে নির্বাক হওয়াই স্বাভাবিক ।

শুধুমাত্র শারীরিক নয়, আত্মিক সঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়ানো কৃষ্ণা আমাদের চেতনায় বেদনার সঞ্চার করে । সতীনের দৃষ্টিতে তার আচরণ কোনও কোনও সময়ে পাগলামির পর্যায়ভুক্ত । মাইগ্রেনের তীব্র যন্ত্রণাতেও সে অস্থির হয়ে উঠেছে । তার ভাই দিলীপ উন্মাদ হয়ে গিয়েছিল । মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু ঘটে তার । মা-ও বদ্ধ উন্মাদ ; এই অবস্থাতেই গালুডিতে মৃত্যু ঘটেছে তাঁরও । অর্থ-সম্পত্তি, লোকজন কোনও কিছুর ঘাটতি না থাকলেও কৃষ্ণা ছিল শান্তি-বিহীন—চরম একাকী । তার শূন্যতার যন্ত্রণাকে জীবনানন্দের ভাবনায় ও ভাষায় চিহ্নিত করা যেতে পারে :

—তবু কেন এমন একাকী ?
তবু আমি এমন একাকী ।
(জীবনানন্দ, 'বোধ')

আত্মহননের প্রচেষ্টার ভিতরেই সে হয়তো তার শূন্যতার জ্বালাকে শেষপর্যন্ত জুড়াতে চেয়েছে ।

একদা সুলেখার শরীর ও মন দু'দিক থেকেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিল । স্বামী কৃষ্ণপদর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক তাতে সে ছিল চরম অভাবেই অসুখী । এই অবস্থাতে সে কলকাতায় চলে এসেছে নতুন করে বাঁচবার লক্ষ্যে । মহীনকে নির্ভর করেই লালিত হয়েছে তার স্বপ্ন । সুলেখার মানসিক দৃঢ়তা, জীবনকে নতুন খাতে বইয়ে দেওয়ার সুগঠিত বাসনা এবং সুস্থতার প্রতি উদগ্র আকর্ষণের কাছে শেষাবধি মহীনের দ্বিধা এবং সংশয় তুচ্ছ হয়ে গেছে । সুলেখা জানে, —শুধুমাত্র জলহাওয়া নয়, আমাদের বাঁচার প্রধান শর্ত সুখ -শান্তি, স্বস্তি । অসুখের মলিনতাকে উপেক্ষা করে সামনের

দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা সুলেখার গাঢ় জীবন-পিপাসার পরিচয়কে বহন করেছে ।

সুলেখার মত আর একজনের মধ্যেও আমরা তীব্র জীবন-বোধের পরিচয় পাই । জগ-ময় । অতীতটা তার কাছে সুখপ্রদ ছিল না । অন্ধকার অনেকবারই ছোবল দিয়েছে তাকে । শেষ পর্যন্ত সে টিকে থাকতে সমর্থ হয়েছে জীবনী শক্তির উষ্ণতাকে সম্বল করেই । পারিপার্শ্বিক-প্রতিকূলতাকে সে ডিঙিয়ে যেতে চেয়েছে —যা তার সাবল্য সম্বন্ধে আমাদের নিঃসন্দেহ করে । জগ-ময়ের ঔদার্য এবং দৃঢ়তা হতাশার বিবর্ণ পটভূমিতে সহৃদয়তার আশ্বাস হিসাবে বিবেচনার দাবি রাখে ।

অন্যান্য চরিত্রাদির মধ্যে বিনয়ভূষণের অসুস্থতাকে লেখক নিয়তিবাদী ভাবনার উপমান রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন বলে মনে করা যেতে পারে । ক্যানসারে আক্রান্ত ওই প্রৌঢ় মানুষটির মধ্যে কোনও ব্যস্ততা নাই , চিৎকৃত অভিযোগ নাই , নীরবেই যেন সমস্ত কিছুকে তিনি সহ্য করেছেন —মেনে নিয়েছেন ।

অবশেষে আমরা সতীনের কথা ভাবব — যে বিশেষ অর্থেই কালের নায়ক রূপে গণ্য হওয়ার যোগ্য । সতীনের যে যন্ত্রণা—আমাদের মনে হয় তা প্রতীকায়িত । এই যন্ত্রণা যুগের বুকে মানবাত্মার । অবজ্ঞা—অপমান—দূরত্ব সবকিছুই চরিত্রটিকে যন্ত্রণাদীর্ণ করেছে । প্রথম পর্বের সমাপ্তি স্তরে আমরা লক্ষ্য করেছি বাবার মৃত্যুতে সতীনের অনুভবে ধরা পড়েছিল এক অদ্ভুত শূন্যতা । অসহ্য ব্যথায় সে কেঁদে উঠেছিল সে-দিন । দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি - পর্যায়েও দেখা গেছে সতীনের চোখের জল বাধা মানেনি । মানবিক সম্পর্কের চরম অবক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে এই অশ্রু যে গভীর বিষাদেরই উৎসারণ —সে ব্যাপারে সন্দেহ কোথায় ? কি-তু একই সঙ্গে মনে রাখার প্রয়োজন অশ্রু বিসর্জনের অব্যবহিত পূর্বে সতীনের প্রতিবাদ —বিদ্রোহ অন্য কিছু নয় ; কালের যে সঙ্কট তারই অনিবার্য প্রতিক্রিয়ার চরম বিস্ফোরণ ।

নিরস্ত্র—শব্দটির মধ্যে প্রচ্ছন্ন রয়েছে এক ট্র্যাজিক ভাবনা। অস্ত্রহীন ব্যক্তি প্রকৃতই দুর্বল; অন্তত প্রতিপক্ষ যদি সশস্ত্র ও শক্তিশালী হয়। তবুও একটা সময় আসে, যখন পিছনে হঠতে হঠতে দেওয়ালে পিঠটা যায় ঠেকে। সময় আসে ঘুরে দাঁড়ানোর —রুখে দাঁড়ানোর। অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে পাল্টা আঘাত হানার। 'নিরস্ত্র' (১৯৮২) উপন্যাসটির মধ্যেও দেখা যায় সেই রকম বিপন্ন, নিরস্ত্র মানুষের জীবন-পণ; মার খেতে খেতে এক সময়ে তার মরীয়া হয়ে ওঠা।

আমাদের এই ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-ব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে যৌবনের করুণ অপচয়। এই যৌবন যে কোনও মুহূর্তেই নিজেকে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু বিনিময়ে সমাজের কাছ থেকে কোনওদিনই পায় না বাঁচার সুস্থ আশ্বাস। সামান্যতম মর্যাদা থেকেও সে বঞ্চিত। গভীর হতাশা ও তিক্ততার মধ্যেও কিন্তু মূল্যবোধ থেকে বিচ্যুতি ঘটে না তার। কিছুতেই সে মুছে ফেলতে চায় না মমতার স্নিগ্ধ ও পবিত্র দাবিকে। তাই জীবনকে বাজি রেখেই রুখে দাঁড়িয়েছে উপন্যাসের নায়ক বোধন। বোধনের জেহাদ তাদের বিরুদ্ধে —যারা এই পৃথিবীর আলো বাতাসকে বিষিয়ে তুলতে চায়। অস্বীকার করতে চায় মমতার পবিত্র ভাষাকে। যারা অন্যায় এবং অস্থিরতার গন্ডিতেই আবদ্ধ। তবুও বোধন পরোয়া করে না। সমস্ত ভয়কে সে তুচ্ছ করেছে। অ্যাম্বুলেন্স করে যাকে সে হাসপাতালে পৌঁছে দেবেই। তাঁকে যে কোনও প্রকারে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। অনেক কিছু হারিয়ে গেছে বোধনের। আরও কিছু হারিয়ে ফেলতে সে রাজি নয়। সীমিত শক্তি নিয়েই তাই সে গর্জে উঠেছে। তাকে গর্জে উঠতে হয়েছে অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্যে; নিজের অদম্য ইচ্ছাকে রূপায়িত করার একান্ত তাগিদে।

উপন্যাসে লক্ষ্য করা গেছে, শিবশঙ্কর এবং সুমতি—দু'জনেই অসুস্থতা কবলিত। দু'জনেই প্রায় নিঃশেষিত। অথচ এক সময় তাদের চোখে স্বপ্নের অভাব ছিল না। এখন সব কিছু এলোমেলো হয়ে গেছে। পঙ্গু শিবশঙ্কর তবুও নিজের চারপাশে ঔদাসীন্যের একটা পাঁচিল তুলে নিতে পেরেছেন, সহস্র গঞ্জনা-অভিযোগ সত্ত্বেও গুটিয়ে যাওয়া হতমান মানুষটি প্রায় নিরুত্তর। মনে হয়, এই নীরব ভঙ্গি যেন অসার সরবতায় কৃত্রিম হয়ে ওঠা জীবন-ধারার প্রতি ব্যঙ্গের নামান্তর। সুমতি

আবার তার থেকে একটু আলাদা। অসুস্থ শরীর আর বিধ্বস্ত মন নিয়ে কি-দুমাত্র চলবার শক্তি তার নাই। এক লহমার জন্যেও জীবনকে সুন্দর বলে ভাবতে তিনি রাজি নন। সংসারের বোঝা বইতে বইতে সুমতির অনুভূতি সহন-ক্ষমতা—সব কিছুই হারিয়ে গেছে। প্রায় প্রতি মুহূর্তে তাই তিক্ত-তার প্রকাশ লক্ষিত হয়েছে সুমতির আচরণে। যাবতীয় সুখ হীনতার আগুনে পুড়তে পুড়তেও সুমতি কি-তু তাঁর বিবেক-প্রসূত এক ধরনের বিশেষ মূল্যবোধের প্রতি সশ্রদ্ধ থাকতে দিধা করেননি। তাই শরীরে ও মনে পঙ্গু স্বামী শিবশঙ্করের লাঞ্ছনা তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছে। বাঘিনীর মত সক্রোধে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা করেননি আত্মজার উপরেও।

বিনুদের অবস্থা বোধনদের মত নয়। আর্থিক প্রতিকূলতা তাদের জীবনে অভিশাপ ডেকে আনেনি ঠিক, কি-তু সুখের অভাব অনুভূত হয়েছে তাদের পরিবারেও। বিনুর মা অনুপমা শারীরিকভাবে অসুস্থ, যখন তখন ফিট হয়ে যাওয়ার রোগ তাঁর। এই রকম এক বিপজ্জনক মুহূর্তে বোধন বিনুর মাকে পরিচর্যা করেছিল। সে না থাকলে ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। এমন কিছু বেদনার্তি, দুঃখবোধ অনুপমার বুকের মধ্যে সংগুপ্ত রয়েছে —যা তাকে অসুখী করে, অসুস্থ করে তোলে। বিনু জানিয়েছে,—

> মা বড় অদ্ভুত। কখনো চেঁচামেচি করবে না,
> ছটফট করবে না, যা হবে সব পুষে রাখবে।
> তারপরই ওই রকম।

তাছাড়া বিনুও বড় রুগ্ন—অশক্ত। সামান্য কিছুতেই শরীর খারাপের ধাত তার। বিনু নিরাপত্তার অভাব-বোধেও পীড়িত। রাজুকে বিয়ে করে এই সমস্যা-সমাধানে আগ্রহী সে। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, বিনু তার কাকার প্রতি সন্তুষ্ট নয়, এমন কী গর্ভধারিণীও তার ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই জন্যেই এক ভয়ঙ্কর অসুখের কালো রেখা থেকে ছিটকে এসেছে বিনুর ক্ষোভ — 'I do not like my mother'

উপন্যাসের মধ্যে মাদকাসক্ত মনুয়া, আর বোমা বাঁধতে গিয়ে মারাত্মকভাবে আঘাত পাওয়া ছেলেটি নোটন — যাকে দলের ছেলেরাই গুলি করে মেরে ফেলেছিল; এবং মাধব, কচা, গোপালদের উপস্থিতি —তাদের ব্যর্থতা হতাশা ও জিঘাংসা চারপাশের ক্ষয়িষ্ণুতাকে নির্দেশ করতে চেয়েছে। সুকুমার —নীলিমারা তবু চেষ্টা করেছে —কি-তু ক্ষতটা সম্পূর্ণরূপে সারিয়ে তোলার মত সামর্থ্য তাদের নাই, ঘাটতি

রয়ে গেছে মানসিকতাতেও । বোধন কিন্তু এই সব কিছু থেকে ব্যতিক্রমী এক নজির । সর্বশক্তি দিয়ে সে ঘোষণা করতে চেয়েছে স্বাধিকারের দাবিকে ।

শারীরিক দিক থেকে বোধন অসুস্থতা যুক্ত, কিন্তু তাদের সংসারের দুর্দশা, চারপাশের সঙ্কট তার তারুণ্যকে উদ্ভ্রান্ত করতে চেয়েছে প্রতি মুহূর্তে । বোধন তার মাকে দেখে মনে-মনে কষ্ট পায় । বিনুর মায়ের সঙ্গে তুলনা করে সে দেখেছে আকাশ পাতাল তফাৎ । শুধুমাত্র স্বভাবে নয়—চেহারাতেও এই অ-মিল বড় স্পষ্ট ।

> বোধনের মা মাথায় মাঝারি । খলখলে, জলভরা চেহারা । বেমানান মোটা দেখায়, ফোলা ফোলা মুখ-চোখ । রক্ত কম থাকলে নাকি ওই রকম হয় । অ্যানেমিয়া । বোধন জানে না । তবে মার মুখ-চোখ খড়ির মতন সাদাটে, বিবর্ণ । গায়ের চামড়া খসখসে । মাথার চুল পেকে যাচ্ছে মার, গালে দাগ পড়ছে কালো কালো । মা যখন অফিসে যায়— বোধন দেখেছে, হাঁফাতে হাঁফাতে, চোখ-মুখ লাল করে ঘামতে ঘামতে ।

বোধন তার মাকে দেখে ভয় পায়, সঙ্কুচিত হয় আবার নীরবে সব মেনেও নেয় । কারণ 'মার হাড়ভাঙা খাটুনি, গায়ের রক্তে তাদের খাওয়া-পরা ।' বাবার জন্যেও বড় কষ্ট হয় বোধনের ।

> কষ্ট এবং ঘেন্না । কে বলবে এই বাবা সেই মানুষ । বছর ছয় আগেও বাবা স্বাভাবিক ছিল, সুস্থ ছিল । * * * আজকাল প্রায়ই কথা বলতে গিয়ে তোতলায় । নিজের ওপর আর কোনো আস্থা নেই, কোনো কর্তৃত্ব নেই বলেই বোধ হয় । বাবার চোখ দেখে বোধনের মনে হয় —মানুষটার চোখ ফাঁকা, মন ফাঁকা, গ্লানি আর লজ্জায়

মরা-মরা, কুন্ঠিত। বড় অসহায় আর অপরাধীর
মত দেখায় বাবাকে। আবার ঘেন্নাও হয়। কেন,
কেন মানুষটা এই রকম হল ?

এ-জিজ্ঞাসায় উত্তর মেলে না। উত্তর বা সমাধান অনেক কিছুরই মিলতে চায় না সহজে। শিবশঙ্করও ক্রস-ওয়ার্ড মেলাতে চেষ্টা করেন, লটারির টিকিট কাটেন, যদি কিছু একটা মিলে যায়; বন্ধ দরজাটা হাট করে খুলে গিয়ে যদি এক ঝলক রোদ্দুর তাদের সংসারটাকে ভাসিয়ে দেয়। কিছুটা সুখ, কিছুটা অন্তত স্বস্তি। কিন্তু পাথর চাপা কপাল, সেই রকম ঘটে না কিছুই। অথচ একদিন তাদের সংসারটাও অন্যরকম ছিল। প্রায় সমস্ত কিছুই ছিল সুস্থ-স্বাভাবিক, নিয়মমাফিক। বোধনের মা একদিন হলুদ আর টিয়া সবুজ শাড়ি পরতে ভালবাসতেন, হাসি ঝরত তার বাবার গলা থেকেও।

সেই মা কোথায় হারিয়ে গেল। কোথায়
যেন মরে গেল সেই বাবা। যা জীবন্ত
ছিল তখন, আজ তা মৃত। এখন যাকে
দেখলে কেউ বলবে না যা কোনদিন
স্বাস্থ্যবতী, সুশ্রী, সাদামাটা বউ ছিল
বাড়ির। যাকে এখন বিশ্রী মোটা, ফোলা,
খড়ির মতন সাদাটে, কাঁচা পাকা চুলের
এক বুড়ির মত দেখায়। সবই দুর্ভাগ্য।
বাবা, মা, ছেলে মেয়ে সকলের দুর্ভাগ্য।
বাবার যদি চাকরি না যেত, দুর্ঘটনা না
ঘটত আজ সংসারের এ অবস্থা হত না।
তারা মোটামুটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থাকতে পারত।

এত কষ্ট —এত তিক্ততা, তার মধ্যেও কিন্তু সুমতির বুকে স্বামীর জন্য আকুলতা চিরতরে শুকিয়ে যায়নি। এই আকুলতা ফল্গুধারার মত —উপর থেকে বোঝা যায় না। প্রচণ্ড পরিশ্রমে কাতর সুমতির জন্যে শিবশঙ্করের সহানুভূতিতে—সুমতি বলেছেন,

"মরেই তো আছি । না হয় বরাবরের জন্য
মরব । তোমার মতন খোঁড়া, অকর্মণ্য মানুষটার
তখন কি হবে তাই ভাবি ।"

অশেষ দুর্গতির মধ্যে সুমতি মরে গিয়ে বাঁচতে চেয়েছেন ; কিন্তু সেই চাওয়ার মধ্যেও বোধহয় ফাঁক থেকে গেছে । মরেও তার শান্তি নাই । মুখে যাই বলুন না কেন, সংসার সন্তান-স্বামী সব কিছুর দায়িত্ব এখন তো তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়েছে । তাই ধুঁকে ধুঁকে হলেও তাঁকে চলতেই হবে, অন্য কিছু উপায় অজানা তাঁর ।

সুমতি একের পর এক অনেক কিছুই সহ্য করে গেছেন, কিন্তু এক সময় সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছে । চুয়া যখন শিবশঙ্করকে মিথ্যুক, ধাপ্পাবাজ বলে টাকা ফেরৎ না দেওয়ার আক্রোশ চরিতার্থ করতে চেয়েছে —তখনই ঘটে গেল বিস্ফোরণ । সুমতি মাত্র কিছুক্ষণ আগেই স্বামীকে গালমন্দ করেছেন, কিন্তু মেয়ের দ্বারা বাবার এই ধরনের লাঞ্ছনা তিনি বরদাস্ত করতে রাজি নন । সক্রোধে তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছেন মেয়ের উপর । তাঁর তখন হুঁস ছিল না । আঘাতে -আঘাতে জর্জরিত হয়েছে চুয়া । তার শরীর ফেটে রক্ত ঝরছিল ।

বোধন আর সহ্য করতে পারল না ।
মার হাত থেকে ব্যাগ কেড়ে নিল ।
"কি করছ ! মেরে ফেলবে ওকে ?"
"মরুক ও ।" সুমতি জোরে জোরে হাঁফ
নিচ্ছিলেন । ভীষণ কষ্ট হচ্ছে শ্বাস
টানতে । চোখের দৃষ্টি উন্মাদের মতন ।
সমস্ত মুখ টকটকে লাল হয়ে গিয়েছে ।

মেয়েকে যা মরতে বলেছেন, মেয়েও মাকে মরবার অভিশাপ দিয়েছে । শীতের সকাল কখন গড়িয়ে দুপুর হল, খেয়াল নাই কারও ; কিন্তু সুমতি অফিসে যেতে পারলেন না । শয্যাশায়ী হতে হয়েছে তাঁকে ।

সুমতি যে কী বলছিলেন কিছুই বোঝা
যাচ্ছিল না, অসম্ভব জড়ানো, অনেকটা

তোতলানো কথা ; জিব যেন জড়িয়ে বেঁকে
যাচ্ছে । বোধ হয় মাথার যন্ত্রণার কথা
বোঝাতে চাইছিলেন ।

এতকাল যাবৎ সুমতি সচল থেকেছেন । প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দুর্যোগ কাটিয়ে উঠতে চেয়েছেন ; কি-ন্তু আর পারলেন না । ডাক্তারের বিধান—সেরিব্রাল হেমারেজ । অবিলম্বে অ্যাম্বুলেন্স করে যাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে , ডাক্তারের তাই নির্দেশ ; অন্যথায় রোগিকে বাঁচানো সম্ভব হবে না । কি-ন্তু অত সহজে সব কিছু পাওয়া যায় না । যদিও বা পাওয়া যায় —তাও শেষ পর্যন্ত বে-হাত হয়ে যায় । বোধনের অনেক চেষ্টার পর অ্যাম্বুলেন্স এল , কি-ন্তু মোড়েই তা আটকে দিয়েছে মাধব আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা । জখম সাগরেদকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ওদের অ্যাম্বুলেন্সটা দরকার । বোধন তার প্রয়োজনের কথা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে । প্রতিবাদ জানায় । তাছাড়া সে-ই তো কত ছোটাছুটির পর ওটা জোগাড় করেছে । দাবি তো তারই । মাস্তান মাধব কি-ন্তু তাকে পাত্তা দিতে বি-দুমাত্র রাজি নয় ।

বোধন কি-ন্তু মাকে সুস্থ করে তুলবেই । এই ইচ্ছায় মাধবরা কেন —সমস্ত পৃথিবী বিরোধিতা করলেও বোধন আজ তা অগ্রাহ্য করবে । সে প্রায় সর্বহারা , শেষ অবলম্বনটুকুও যদি হারিয়ে যায় ? কি-ন্তু বোধন যে বড় দুর্বল । বড় অসহায় । অর্থ ও পেশী শক্তির আয়ত্তাধীন পৃথিবীতে কতটুকু সামর্থ্য তার ? তবুও শেষ দেখে ছাড়বে সে । হার মানলে চলবে না । আমরা তাই লক্ষ্য করি মরীয়া হয়ে বোধন রুখে উঠেছে । কেন এই পৃথিবীতে তাদের বলে কিছু থাকবে না ....., কেন তাদের জন্যে শুধুই বঞ্চনা আর যন্ত্রণা .... , বোধন আজ একাই এ-সবের বিহিত করতে চায় । কি-ন্তু অসুস্থ সমাজ ব্যবস্থার পাঁক যাদের গায়ে লেগে রয়েছে —সেইসব অস্বাভাবিক-উন্মত্ত মাস্তানদের হাতে প্রচন্ড মার খেতে হয় তাকে । মারের চোটে বেহুঁশ হয়ে লুটিয়ে পড়ে বোধন । অর্ধচেতন মনে টুকরো টুকরো ছবি ভেসে আসে ।

মা, বাবা । মা অচৈতন্য হয়ে বিছানায়
পড়ে আছে । বাবা মার মাথার কাছে

চুপ করে বসে অ্যাম্বুলেন্স আসার অপেক্ষা
করছে। বাবা জানে না, বোধন এখন
রাস্তায় পড়ে আছে।

বোধনের মাথায় চিন্তা জট পাকাতে থাকে। সারাদিন এত চেষ্টা করেও অ্যাম্বুলেন্সটা বে-হাত হয়ে গেল, কী অসহায় তাদের মত দুর্বলদের জীবন!

কী কপাল করেই এসেছিল সে। তারা। বাবা
অক্ষম, অকর্মণ্য হয়ে গেল। মা দুটো ভাতের
জন্য কত কি করল। ছেলে মেয়ে স্বামীকে বাঁচাবার
চেষ্টা করতে করতে মার গায়ের রক্ত জল হল।
আজ মা মরছে। দিদিও বাঁচবার জন্যে ঘর ছেড়ে
পালিয়ে শেষ পর্যন্ত বেশ্যা। চুয়াও চলে গেল
আজ ...। কেন, কেন এরকম হবে?

এর উত্তর কে দেবে? এখানে সমস্যা আছে -- নাই সমাধান। দুর্দশা আছে --কিন্তু নিবারণ কোথায়? অসুখ আছে --যদিও আরোগ্যের সম্ভাবনা অন্তর্হিত। প্রশ্ন জমা হলেও তাই উত্তর মিলতে চায় না সহজে। বোধনের যেন কী হয়ে গেছে। তার মাথায় আগুন -- সারা শরীরেই নিদারুণ দাহ। সব কিছু হারিয়ে ফেলার আশঙ্কায় যন্ত্রণায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে সে। যারা তার মাকে মৃত্যুর গহ্বরে ঠেলে দিতে ইন্ধন জোগায় --তাদের --সেইসব শয়তানদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। উন্মত্তের মতন সমস্ত শক্তি দিয়ে সে একটা বোতল নিয়ে ছুঁড়ে মারে মাস্তান মাধবের দিকে। কিন্তু, —

পেছন থেকে অন্ধকারে কার হাত নেমে আসছে
বোধন জানতে পারল না। হঠাৎ অনুভব করল
পেছন থেকে তার কাঁধের কাছে ধারালো ভয়ঙ্কর
কি বিঁধে গেল; গিয়ে তলার দিকে হাতের পাশ
দিয়ে নেমে গেল। ভাঙা বোতল পড়ে গেল
হাতের মুঠো থেকে।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ল বোধন। ওরা এমনি করেই বেঁচে থাকার—বাঁচিয়ে তোলার স্বপ্ন দেখে; আবার স্বপ্ন-ভাঙা যন্ত্রণা নিয়ে লুটিয়েও পড়ে। কিন্তু প্রতিরোধের —

প্রতিবাদের নিশানটা উঁচু করে তুলে ধরতে ভুল করে না। ক্রমাগত পিছু হঠতে হঠতে দেওয়ালে পিঠ তো একদিন ঠেকবেই। তখনই শুরু হয়ে যায় লড়াই। মরণপণ।

অসহায় নিরস্ত্র মানুষ পরাভূত হয়। তবুও জয়ী হয় সেই অব্যয় মূল্যবোধ—অসুস্থতার গাঢ় অন্ধকার যাকে কালো করে দিতে পারেনি, যা সহস্র আঘাতেও অবিভাজ্য, যা গভীরতর অ-সুখের মধ্যেও অতীব উজ্জ্বল।

সুখের কোনও পরিপূর্ণ রূপ নাই। নিটোল ব্যঞ্জনার মধ্যে তা কখনই মূর্ত হয়ে ওঠে না। মানুষ প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে সুখকে মুষ্টিবদ্ধ করবার অভিলাষে। এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে সকলেরই অনীহা। থমকে গেলেই অনর্থ। সুখ অন্বেষণে মনোযোগী হয়ে অনেকেই আবার নিজেদের জড়িয়ে ফেলে কুৎসিত কোলাহলের ভিতর। অনেকেই হয়ে উঠে মত্ততার শিকার। এত কিছু করেও সুখ-অভিলাষী মানুষ কী কাঙ্ক্ষিত সুখকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়? এত ব্যাকুল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তার মনের অন্দরে কালো ছায়ার মত কেন জেগে থাকে দুঃখের হাহাকার, শোকের বেদনা এবং নিরাপত্তার অভাব? বাহ্যত যাকে আমরা সুখ হিসাবে চিহ্নিত করি —কখনও কখনও বুকের মধ্যে তাই ছড়িয়ে দেয় অ-সুখের শিকড়। সুখকে একান্ত করে চাওয়া এবং পাওয়ার মধ্যে ব্যবধানটা সহজে মুছে ফেলা যায় না কিছুতেই। প্রকৃতপক্ষে এই সুখের কোনও শেষ নাই। 'অশেষ' (১৯৮৩) উপন্যাসটি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য :

> ''বিমল করের 'অশেষ' এমনই একটি গল্প যেখানে বাইরের আয়োজন নেই বললেই হয়। কিন্তু সে আয়োজন উপেক্ষা করেই বিমল কর ব্যক্তির মধ্যে নিহিত থাকে যে অশেষত্বের বিস্ময়, অসীমের ঠিকানা, সুনির্ভর শিল্পদৃষ্টিতে সেটাকেই ফুটিয়ে তুলেছেন।''[৫]

ঔপন্যাসিক বিভিন্ন চরিত্রগুলি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, আমরা সুখের প্রত্যাশায় চক্রাকারে ঘুরেই চলেছি; কিন্তু কিছুতেই যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারছি না। এক অক্ষমতার অ-সুখ আমাদের বিধ্বস্ত করে চলেছে প্রতিনিয়ত।

উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র অশেষ। একদিন সে ছিল উচ্ছল প্রাণবন্ত। হুল্লোড়ের জোয়ারে ভেসে যেতে যেতে সে ভেবেছিল — এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হতে পারে? কিন্তু একদিন সেও পালটে গেল। ঘর-বাড়ি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে অশেষ ব্যস্ত হয়ে উঠল অনাথ আশ্রম নিয়ে। ভাই অবিশেষের আকস্মিক মৃত্যু, মায়ের জীবনাবসান, প্রেমিকা কুমকুমের স্মৃতি, সব কিছুই যেন অশেষের বুকের মধ্যে গাঁথা হয়ে রইল। অশেষের পদচারণায় ক্লান্তি নাই, কিন্তু সুখের হদিস কোথায়? কোথায় পথের শেষ?

উপন্যাসের মধ্যে শচী আর মিলন —এই দু'জনের কথা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। অনেক কিছু পেয়েও তারা এক বেদনাবোধে আক্রান্ত। শচীর মাকে বড় কষ্টের মধ্যে আত্মহত্যা করতে হয়েছিল। এখন তাদের অনেক কিছুই হয়েছে। নতুন ফ্ল্যাটের ছোট সংসারে সাজানো গোছানো সবই। দাম্পত্য জীবনের মধুরিমা থেকেও বঞ্চিত নয় তারা। তবুও মনের মধ্যে কী যেন এক শূন্যতা। ছোট সংসারটির মধ্যেও জমে উঠতে থাকে অবসাদ। এই অবসাদ প্রথমে মনকে গ্রাস করে, পরে গ্রাস করতে চায় শরীরকেও।

> মিলন হঠাৎ বার দুই হাঁচল। নাক টানল।
> "রাত বাড়লে কেমন একটা সিরসিরে ভাব লাগে,
> তাই না?"
> শচী হাতের সেফটিপিনটা আবার চুড়িতে আটকাল।
> "পাখা চালাইনি কিন্তু।"
> "ভালোই করেছ -সত্যিই বুড়ো হয়ে যাচ্ছি।
> অকটোবরেই গা সিরসির করে, মাঝে মাঝেই
> দাঁত কনকন। তোমার আবার বাতবাবুর সঙ্গে
> ভাব-ভালবাসা।
> কী হল গো আমাদের?"

মিলনের একবার প্লুরিসি হয়েছিল। একটু ঠান্ডাতেই সে কাহিল হয়ে পড়ে। মিলনের জন্যে শচী কোনওদিনই মা হতে পারবে না। মিলন এবং শচী অবশ্য

এই দুঃখকে মেনে নিয়েছে, তাছাড়া মিলন সর্বদাই শচীকে আড়াল করে রাখতে চেষ্টা করে,

এটা এই জন্যে যে, শচীর একেবারে
নিভৃত বেদনা। যা তার সত্তার। তার
অস্তিত্বের এক অংশ —সেই বেদনাকে যেন
শচী ভুলে যেতে পারে।

কি-তু ভুলে যাওয়া কী এতই সহজ। এই বেদনা কখন যে জেগে উঠে হঠাৎ-ই মনের মধ্যে ছড়িয়ে যায় —কিছুতেই বোঝা যায় না। কিছু পরেই হয়তো সম্বিৎ ফিরে আসে, সামাল দেওয়ার চেষ্টাও শুরু হয়, কি-তু রেশ তো থেকেই যায়। কখনও কখনও শচী 'অন্যমনস্ক, বিষণ্ন, শূন্য কোনো অনুভূতির আচ্ছন্নতা নিয়ে বসে থাকে, কাজ করে, সেলাই সারে, কি-তু ছটফট করে না। জীবনের দুঃখ আর বেদনা মানুষকে অনেক সময় দার্শনিক করে তোলে। এই দর্শনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে জীবনের এক পরিব্যাপ্ত বিষণ্নতা:

মিলন কেন যেন বোধ করল দুঃখ দুঃখ,
বেদনা, মনোভাব। জীবনের কোন
সাধাসিধে পথ নেই। যা স্বাভাবিক, সরল-
ভাবে ঘটা উচিত তাও বেশিরভাগ সময় ঘটেনা।
গাছের মতন বাড়তে বাড়তে তার কোন ডাল
নুয়ে পড়ে, কোন ডাল বেঁচে যায়, কোনোটা বা
ভেঙে পড়ে, পোকায় খায় —কেউ কিছু বলতে
পারে না। কার মরজিতে জীবন চলে কে জানে।

শচীর বুকের মধ্যেও মিলনের মতই বিষণ্নতা জেগে উঠেছে। এই বেদনা শুধুমাত্র নিঃসন্তান হওয়ার জন্যে নয়। আরও অন্যকিছু। শচী নিজেই জানে না এই শূন্যতার বাতাস কোথা থেকে —কেনই বা বয়ে আসে।

তাহলে? সুখ, শান্তি, নিরাপত্তা —
সবই যেখানে রয়েছে সেখানে শচীর
এই অবসাদ, বেদনা শূন্যতার বোধ

কেন আসে ? তবে কি জীবনের তলায়
তলায় অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা থেকে যায় ?
কী সে আকাঙ্ক্ষা ?
শচী জানে না ।

অশেষের কথা প্রসঙ্গে মিলন শচীকে জানিয়েছে —সবাই একরকম হয় না । কেউ সাধারণভাবে ঘর-সংসার , চাকরি-বাকরি , ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকে ; আবার কেউ বা অন্যরকম , যেমন অশেষ । মিলনের মনে হয়েছে অশেষ একটা ভালো কাজের মধ্যে তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছে । কিন্তু শচীর ভাবনা অন্যরকম :

''তুমি কি ভাব তোমার বন্ধু সুখী ?''
''হ্যাঁ , অসুখী হবে কেন ?''
''মুখ দেখে বোঝা যায় না ।''
শচী অস্পষ্ট করে বলল । কেন বলল ,
নিজের কথা ভেবে , না কি অন্য কিছু
ভেবে বোঝা গেল না ।

অশেষ —এই নামের মত গতিবিধিও তার ঋতহীন । নামটির মধ্যে যেন রূপকার্থ জড়িয়ে আছে । ছেলেবেলায় সে ছিল 'অশেষ দি গ্রেট' । তার অত্যাচারে অস্থির হয়ে উঠেছিল সবাই । সহসাই বদলে গেল অশেষ । সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে যেতে উঠল সে অনাথ আশ্রম নিয়ে । এই ভাবেই হয়তো সে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায় । বন্ধু পত্নী শচীর অবশ্য মনে হয়েছে —অশেষের মধ্যেও ঘটেছে সুখের অভাব ।

অশেষের জীবনে কয়েকটি ঘটনা এমনভাবে দাগ কেটে গেছে —যা সহজে ওঠার নয় । অবশেষে ছিল অশেষের ছোট ভাই । খেলার মাঠে সে অদ্ভুতভাবে মারা গিয়েছিল । খেলতে খেলতে এ ওর ঘাড়ে পড়ল । সবাই উঠে দাঁড়াল , অবিশেষই শুধু উঠে দাঁড়াল না ।

ডাক্তার বা ছোট হাসপাতাল অবশেষকে বাঁচাতে
পারেনি । তাদের বাঁচাবার কিছু ছিল না ।

অবশেষ আগেই মারা গিয়েছে । তার ঘাড়ের
কী যেন ভেঙে গিয়েছিল । মিলনরা শুনেছিল ,
ফাঁসি দিলে নাকি এইভাবেই মানুষ মারা যায় ।
তা যেভাবেই হোক , অবিশেষ চলে গেল ।

মায়ের মৃত্যুও অশেষ সহজে ভুলতে পারেনি । শচীকে ছোট ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুর কথা বলতে বলতে মা-এর কথাও সে জানিয়েছে ,'আমার মা যে কি মানুষ ছিল মিনুর কাছে শুনো । শান্ত , ধীর । ছোটখাট মানুষ । যার মুখে যেন কথাই ফুটত না । মার খুব অসুখ হল । মাস তিনেক ভুগলো । তারপর এক পূর্ণিমার দিন মারা গেল ।' মায়ের মৃত্যুর পর তার বাবা আরও বছর চারেক বেঁচে ছিল ।

"বাবা যতদিন বেঁচে ছিল ঘরবাড়ি সংসারের
একটা ব্যাপার ছিল । তা হলেও বুঝতে
পারতাম —বাবা বড় অসহায় হয়ে পড়েছে ।
বাবা মারা যাবার পর একেবারে স্বাধীন হয়ে
গেলাম আমি ।"

অশেষের কথা শুনে মনে হতে পারে —এই স্বাধীনতা খুবই তৃপ্তিদায়ক । সত্যিই কি তাই ? প্রকৃতপক্ষে অশেষের সামনের রাস্তাটা হঠাৎই সর্পিল হয়ে গেছে । সেখান দিয়ে একা -একা এগিয়ে যাওয়ার মধ্যে হয়তো অশেষ কথিত স্বাধীনতার প্রমাণ থাকতে পারে , — কি-তু স্বস্তি যে ছিল না — নিঃসন্দেহেই বলা যেতে পারে । আশ্রমের কাজের মধ্যে অশেষ সুখের দেখা পেয়েছে কি না —শচী জানতে চাওয়ায় অশেষ বলেছে ,

"তা বলতে পার । তবে সুখ জিনিসটা সব
সময় বোঝা যায় না , ওটা বাতাসের মতন,
জোরে বইলে গায়ে লাগে , নয়ত বোঝা দায় ।
তুমি বরং বলতে পার , এই কাজকর্ম করে আমার
দিন কেটে যাচ্ছে , কখনও কখনও ভাল লাগাটা
বুঝতে পারি । কখনও বুঝি না ।"

অশেষ জীবনের একটা বিশেষ দিককে স্পর্শ করতে পারেনি। দাম্পত্য জীবনের মধুর স্পর্শ থেকে সে বঞ্চিত। মিলন এবং শচীর সংসারে এই মাধুর্যের স্বাদ সে পেয়েছে। কলকাতায় ডাক্তার দেখাতে এসে সে শচীর সেবা আর বন্ধুর উৎকণ্ঠিত সহৃদয়তায় মুগ্ধ হয়েছে। অনেক কিছু পাওয়ার মধ্যেও অবশ্য অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখ তাকে ম্রিয়মাণ করে তুলেছে।

অশেষ জীবনের বেদনাকে গাঢ় করে তুলেছে কুমকুম। প্রেমিকাকে একদিন সে পরিত্যাগ করেছিল; কিন্তু স্মৃতিকে সহজে ভুলতে পারেনি। কুমকুম প্রসঙ্গে প্রথমে পরিহাসের সুরে সে শচীকে বলেছিল,—

> ".....আর যদি ভালবাসার কথাই ধরো,
> সব ভালবাসাই ফুলের মতন। একবেলা
> থাকে, অন্যবেলায় ফিকে হয়ে যায়, পরের
> দিন আর থাকে না।"

কিন্তু পর-মুহূর্তেই তার ব্যর্থার্ত উপলব্ধি মনের মধ্যে দাগ কেটে যায়।

> "গন্ধ শুকোয়। কিন্তু গন্ধের মধ্যে
> যে পরিচয়টা থাকে সেটা তো শুকোয় না।
> তা যদি শুকোতো তবে আজ যা গোলাপ
> কাল তা গাঁদা হতে পারত, আজ যেটা
> বকুল কাল সেটা বেলফুল হয়ে দাঁড়াত।
> নয় কি, বলো? সব ফুলই প্রকৃতির,
> তার জন্ম আছে। ফুটলো যখন বেশ
> দেখালে। ঝরল যখন—তখন আর চিহ্ন
> নেই। তবু তার একটা ভেতরের পরিচয়
> সে রেখে যায়। সেটা তার চেহারা নয়
> শুধু, গন্ধেরও।"

কুমকুমের সঙ্গে পরে অবশ্য দেখা হয়েছে অশেষের। কিন্তু এ কুমকুম আগেকার কুমকুম নয়। এই কুমকুমের মুখ পুড়েছে, প্রচণ্ড জ্বালায় মনও পুড়েছে। অশেষ মিলনকে বলেছে,—

"সত্যি বলতে কি কুমকুম আজ যদি তোর
সামনে এসে দাঁড়ায় তুই তাকে চিনতে পারবি
না। তার মুখের একটা পাশ পোড়া। পুড়ে
বিশ্রী এক চেহারা হয়েছে। যে পাশটা পুড়েছে
সেই পাশের চোখ দিয়ে দেখতে পায় না। মাথার
চুল বোধহয় নকল। ওর কোনো বিশ্ছিরি ব্যাপার
আছে ভেতরে। আমি জানি না। স্বামী বা ছেলে-
মেয়ে সম্পর্কে কুমকুমের যে টান আছে —তাও নয়।
অন্তত স্বামী সম্পর্কে নয়।"

আশ্রমের জন্যে কুমকুম টাকা দিলেও শেষ পর্যন্ত অশেষ সেই টাকা ফিরিয়ে দিয়েছে। তার মনে হয়েছে —কুমকুম এই টাকা দিয়েছে জেদ এবং জ্বালা থেকেই। অহঙ্কারের টাকাটা নিলে সমস্যা বাড়তেই পারে। ঘুমের মধ্যে কুমকুম অশেষের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

'তুমি এরকম কেন? যখনই যা দিতে চেয়েছি
নিতে এসে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছ?'
অশেষ বলল, 'আমি বড় ভীতু কুমকুম।
মানুষ তার বাইরেটা ঝোঁকের মাথায় দিতে
পারে। ভেতরের দেওয়াটা বড় কষ্টের।
সেখানে নিত্যদিন দিতে হয়, নিজের সমস্ত
কিছু নিঃশেষ করে দিয়ে বাঁচতে হয়। তুমি
অমন করে দিতে পারবে না।'

অশেষ ভুলতে পারেনি কিছুই। ভুলতে পারেনি অবিশেষকে, ভোলেনি কুমকুমকেও। কিন্তু চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে অশান্ত বেদনা আর অ-সুখের গভীর হাহাকার। তাই অশেষ কিছু গ্রহণ করেও পরে তা পরিত্যাগ করেছে। চেষ্টা করেছে নিজেকে সাধ্যমত উজাড় করে দিতে, যদি সমস্যা থেকে ত্রাণ পাওয়া যায়। এই জন্যেই সে বেছে নিয়েছে অন্য এক জীবন; খুঁজে পাওয়ার ইচ্ছা —জীবনের প্রকৃত ছন্দ। অশেষের দু'চোখে সুখ ও স্বস্তির সন্ধানী আলো। বুকের আর্তিকে — মনের অ-সুখকে মুছে ফেলতে হবে —থামলে চলবে না —পথটাও যে অশেষ।

সুন্দর গন্ধ কে না ভালবাসে ? সুরভিত পরিবেশ প্রতিটি মানুষকেই উপহার দেয় সজীবতার আশ্বাস । সুগন্ধ –শব্দটি প্রয়োগ করার সঙ্গে-সঙ্গেই মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায় একরাশ ফুলের মিষ্টি হাসি । আলোচ্যমান উপন্যাসটিতেও ভেসে এসেছে ফুলের গন্ধ । অন্য কোনও ফুল নয় : নিমফুল । 'নিমফুলের গন্ধ' (১৩৯২) উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে পরিচিত পৃথিবী আর তার মানুষজনের কথা তুলে ধরেছেন । এই ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি ভুলে যাননি প্রতিদিনের তুচ্ছতা, তিক্ততা আর ভালবাসার অমোঘ সত্যকে । তাঁর মনে হয়েছে জীবন এখন বিপন্ন । সংঘাত এবং ক্লান্তির মধ্যে মানুষের যন্ত্রণা প্রতিনিয়ত তাকে ঠেলে দিচ্ছে শূন্যগর্ভ ভবিষ্যতের দিকে । তবুও জীবন চলমান বর্তমানকে আকুল আবেগে আঁকড়ে ধরে ; এগিয়ে যেতে থাকে অপরিমেয় উষ্ণ আশায় । বুকের গভীরে ছড়িয়ে দিতে চায় স্নিগ্ধতার ঢেউ । উপন্যাসভুক্ত প্রায় সব চরিত্রগুলির মধ্যেই রয়েছে গ্লানির দুঃসহ ভার । তবুও তারা সহজে ভেঙে পড়ে না । ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়েই সামনের দিকে তাকানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখে । নিমফুল শব্দটির মধ্যে ফুল এবং গন্ধের সঙ্গে অন্যতর ব্যঞ্জনাও অনুভূত হয় । এই ব্যঞ্জনা জগৎ এবং জীবনের রূঢ় ও তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ইঙ্গিত করতে চায় । উপন্যাসকার সেই তিক্ততার কথা স্মরণে রেখেও তা অতিক্রমণে সচেষ্ট হয়েছেন ।

ফুল ফোটে, -- এ ব্যাপারে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ? সংশয় নাই, সৌরভের বিবশ মায়াতে আমরা আচ্ছন্ন হই । কিন্তু এতো কখনও-সখনও । দু'একদিনের পবিত্র সৌন্দর্য দিয়ে প্রতিদিনকে ভরিয়ে তোলা অসাধ্য । যন্ত্রণার্ত মানুষও তার অ-সুখ কী ভাবে দূরে সরিয়ে দেবে ? আরোগ্য উপযোগী স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তো প্রায় বিনষ্ট হতে চলেছে । তাই ঔপন্যাসিক প্রেমের প্রদীপটি প্রজ্বলিত করেও তার কম্পমান ভীরু শিখার দিকে বিহ্বল-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন ; -- নিভে যাবে না তো ? উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসাবে স্বীকৃত আনন্দ, মণিমালা এবং বিজয়ার দিকে তাকালে বুঝতে পারা যাবে এরা প্রত্যেকেই অসুখী । মনের সুখহীনতার মত শরীরেও অসুখও এদের ম্রিয়মাণ করেছে । পারিপার্শ্বিক বিষণ্ণতায় সহজেই আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে এই সব চরিত্রগুলি ।

উপন্যাসটির প্রথম ভাগেই দু'টি মৃত্যু-প্রসঙ্গ চোখে পড়ে। একজন ভাদুড়ীবাবু। নাম তার শান্তি, কিন্তু কোন্ এক অশান্তির শিকার হয়েই তাকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। অপরজন তনুদা,— যে মণিমালাকে পড়াতে আসত।

> পড়া বুঝিয়ে উঠে যাবার সময় বলল,
> 'কাল আর আসব না। নিজেই পড়ে
> নিবি।' তনুদা গায়ের কড়কড়ে চাদরটা
> জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। পরের দিন
> সকাল বেলায় পাড়া জুড়ে হই হই।
> তনুদা আত্মহত্যা করেছে।

মণিমালার মনে হয়েছে —বাইরে থেকে মানুষের ভিতরকার কথা জানা আদৌ সম্ভব নয়। আমাদের ভিতরকার অসুখ শুধু প্রবলই নয়, তা রীতিমতন জটিলও। সহজে ধরা যায় না।

> বাইরে থেকে দেখলে জীবনের অনেক কিছুই
> মনে হয় শান্তি। যে মানুষটা চলে গেল
> তার কাছ থেকে তা শোনা যাবে না —সে
> যাবার সময় শান্তি নিয়ে গিয়েছিল, না
> অপমান গ্লানি আর শুধু কষ্ট নিয়েই।

বিজয়ার বুকের মধ্যেও রয়েছে এক তীব্র যন্ত্রণার অ-সুখ। দেওয়ালির রাত যখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, তখনই তার ভাগ্যে ঘনিয়ে এল বিপর্যয়ের গাঢ় অন্ধকার। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করেছিল তার স্বামীকে। সেই ভয়ঙ্কর রাতটাকে কোনও-দিনই ভুলতে পারবে না বিজয়। তার পর কত ঝড়-ঝাপটা সামলাতে হয়েছে তাকে। আনন্দ বিজয়া সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করেছে,—

> আজ বউদির সেই চেহারা কতটুকুই বা আছে।
> না, আর ছিপছিপে নেই গড়ন, সামান্য ভারী
> হয়েছে, বড় এখন কালোই দেখায় মাথার চুল
> কমেছে, দু'দশটা চুল সাদাও হয়েছে সামনের

দিকে , চোখ আর ঝকমকে নেই , উদ্বেগ
দুশ্চিন্তা অবসাদ দুঃখ —কত কি মাখানো
যেন ।

ক্ষত-বিক্ষত হয়েও বিজয়া লড়াই চালিয়ে গেছে । কিন্তু তার দম ফুরিয়ে এল বনে ।

উপন্যাসটির মুখ্য চরিত্র আনন্দ । নামের মতই সে আনন্দ মাখা । হয়তো চরিত্রটির নামের সঙ্গে মিশে আছে রূপকাভাস । উপল-বন্ধুর পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আনন্দও অবশ্য আনমনা হয়ে গিয়েছে । সে যতই পরিহাস রসিক জীবন-দৃষ্টির অধিকারী হোক না কেন , জটিল পৃথিবীর তমসাবৃত পরিবেশ তাকেও গ্রস্ত করেছে । সামান্য প্রেস —কতই বা তার আয় , —এরই ভিতর টেনেটুনে চালাতে হবে । কোনওরকমে বেঁচে থাকতে হবে পৃথিবীর কঠিন অসুখের মধ্যে —একদল স্বার্থান্ধ মানুষের ভিড়ে । তবুও আনন্দ দিক্-ভ্রান্ত হয় না । তার বিশ্বাস যৌবন কখনই ক্ষয়িষ্ণু হতে পারে না । শরীরে ও মনে বিধ্বস্ত হয়েও তাই আনন্দ হাস্যময়— অবিচলিত । আনন্দকে দেখে কিছুতেই বোঝা সম্ভব নয় —কী অপরিমেয় প্রাণশক্তির অধিকারী সে !

মণিমালা আনন্দকে দেখছিল । রোগা ফরসা , গালভাঙা
ওই মানুষটার দিকে তাকালে বোঝাই যায় না , প্রায়
একেজো একটা ফুসফুস নিয়ে ও বেঁচে আছে । একেজো
ফুসফুস , ভাঙা হাত । বা হাতের কনুয়ের কাছটায় ধনুকের
মতো বাঁকা আনন্দের । পায়ে বন্দুকের গুলিও খেয়েছিল একবার।
ওকে দেখে এ সব ধরা যায় না । অদ্ভুত ছেলে । ওর
চেহারার মধ্যে বুদ্ধির কোনো ছাপ নেই , চোখের জ্বলজ্বলে
ভাবটা সারল্যের , অফুরন্ত জীবনীশক্তির ।

আনন্দের মধ্যে জীবনীশক্তির অভাব নাই ঠিক , কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেও ক্ষয়ে যাচ্ছিল । আসলে আনন্দ এমন এক পৃথিবীর বাসিন্দা —যেখানে পাওনা শুধু দারিদ্র ক্লান্তি , রোগ এবং অবশ্যই হতাশ্বাস ।

আনন্দ বেশ বুঝতে পারছিল , বর্ষার জল ,
স্যাঁতস্যাঁতানি , ভেজা জামাকাপড় তার আর

সহ্য হচ্ছে না । বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে ।
কত বয়স হল । ছত্রিশ কি ? ওই রকম
হবে একটা কিছু । এক আধ বছর কম
বেশিতে আসে যায় না । সোজা কথা,
শরীর এবার পড়ার দিকে । বড় তাড়াতাড়ি
সূর্য হেলছে রে । বড় তাড়াতাড়ি ।

প্রায় সবদিক থেকেই বিভিন্ন সমস্যার জালে আনন্দ জড়িয়ে যাচ্ছিল । 'এ ভাবে চললে আর কতকাল চালাতে পারবে আনন্দ জানে না ।'

হরিজন সমাজের ছেলে রজনি ছিল আনন্দর ছেলেবেলার বন্ধু । রাজপুত আর হরিজনের সংঘাতের সময় তার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছিল । সেদিন রজনির অনুরোধ অগ্রাহ্য করতে পারেনি সে । পরে এরই জের হিসাবে গোলমালের মধ্যে পড়ে গিয়ে পুলিসের গুলি খেতে হল তাকে । গুলিটা পায়ে না লেগে বুকে লাগলে তাকে আর ঘুরে বেড়াতে হত না । 'এক এক সময় মনে হয়, তখন যদি একটা কিছু হয়ে যেত —ভালই হত । বাঁচত আনন্দ ।'

উপন্যাসে পারুল বৌদির যে ছবি আমরা পেয়েছি —সেটিও বড় বিষণ্ণতা মাখানো । বাচ্চা হব হব করেও নষ্ট হয়ে গেছে তার । ওষুধ —পথ্য আরাম কিছুই নাই । রক্তহীন শরীরে তবুও প্রত্যাশার লগ্ন গুণে অনাগত আশাকে সযত্নে লালন করে চলা । যে শিশু আসছে —সে হয়তো রৌদ্রোজ্জ্বল পৃথিবীটা পেয়ে গেলেও পেতে পারে ।

মণিমালা উপন্যাসের এক বিশিষ্ট নারী চরিত্র । মণিমালার মনের মধ্যেও সুখ অন্তর্হিত । মা-বাবা -দাদাকে হারিয়ে মণিমালা বড় একা হয়ে গিয়েছিল । বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের অন্ধকার দিক —তার কর্কশ স্পর্শটা সে বুঝতে পেরেছিল । সে চেষ্টা করেছে পরিস্থিতির সঙ্গে সমঝোতা করে চলতে, অনেক কিছু সহ্য করে নিতে; যদিও এক অসহনীয় বেদনা তাকে ম্লান করে দিয়েছে । জীবনটা বোধহয় এই রকমই । কত কী হারিয়ে গেল, কত কিছুর হদিশই পাওয়া গেল না । পূর্ব-স্মৃতি মণিমালার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, —

> মণিমালার যখন ছেলেবেলার কথা মনে হয়—
> তখন সে দেখে এই বাড়ির মানুষজন ইঁট
> কাঠ—সব কিছুর সঙ্গে তার জীবন যেন জড়িয়ে
> মাখামাখি হয়ে ছিল। সে জীবন এখন আর
> নেই। এই বাড়িতেই সে আছে, ইঁট কাঠেরও
> বদল হয়নি, বাইরের বাগানের পেয়ারা —
> বাতাবিলেবু গাছ — তারাও তো তেমনই আছে—
> তবু কোথায় গেল নিজের জীবন দিয়ে জড়ানো
> সেই আনন্দ, সুখ, ভাললাগা ! তারা কোথায়
> হারিয়ে গেল।

এই যে হারিয়ে যাওয়ার বেদনা —অতীতমগ্নতা, এও এক ধরনের অ-সুখেরই ফলশ্রুতি। জীবন যখন বর্তমানের কঠিন পাষাণে বার-বার মাথা খুঁড়তে থাকে; তখনই ভেসে আসে সেই সব সোনালী দিনের সুখ-স্মৃতি। সেই সব দিনগুলি বড় আনন্দের —বড় সুখের ছিল। কিন্তু কোথায় গেল সেই সব অমোঘ মুহূর্ত, কোথায় গেল সেই সব স্বপ্নদেখা, তৃপ্তিমাখা সুখের মিছিল ?

> .....কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
> বেদনা জাগাতে ভালবাসে !
> হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
> তুমি আর উড়ে উড়ে কেঁদো নাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।
> (জীবনানন্দ, 'হায় চিল')

বর্তমানের গহন অন্ধকারে সবই বুঝি ঢাকা পড়ে গেল। তবুও পাপড়ি মেলা মন আমাদের, ভাঙা-চোরা সর্পিল পথের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে উন্মুখ হয়ে থাকে কিছুর প্রত্যাশায়। দূর থেকে গন্ধ ভেসে আসে। নিমফুলের গন্ধ। এ-গন্ধ ভালবাসত মণিমালার হারিয়ে যাওয়া দাদা, ভালবাসত মণিমালা।

এবং আনন্দ । এখনও অপরিসীম গ্লানির মধ্যে ওরা সেই ঘ্রাণ নেওয়ার চেষ্টা করে । নিমফুলের গন্ধে সব অসুখ সেরে যাবে । আশার বাতাসে সাঁতার কাটতে কাটতে ওরা একটু স্বচ্ছন্দ হতে চায় । অন্ধকারেও জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে দুটি মুখ । সে মুখ আনন্দর —মণিমালার ।

।। উল্লেখপঞ্জী ।।

১. 'শেষের কবিতা'র অমিতের সঙ্গে অবিন চরিত্রের তুলনামূলক বিচারে বলা যায়; অবিনের মধ্যে যে উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে —তা একান্তই গদ্যময়; মানবিক আবেদনও তার মধ্যে বেশি মাত্রাতে ধরা পড়ে। বেপরোয়া আবেগোচ্ছ্বাসকে বহন করেও বাস্তবের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে অবিন পূর্ণমাত্রাতেই সচেতন।

২. প্রসঙ্গত শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসটিকে স্মরণ করা যাক। দুর্দান্ত, অত্যাচারী ও মদ্যপ জমিদার জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরে নতুনভাবে বেঁচে উঠতে চেয়েছিল। একই ভাবে অনেক ঘাত-প্রতিঘাত—অনেক টানা পোড়েনের মধ্যে যতিকিশোরও সরসীকে অবলম্বন করে নতুনভাবে বেঁচে উঠতে চেয়েছে। মুছে ফেলতে চেয়েছে ব্যর্থতা ও যন্ত্রণার গ্লানি।

৩. ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'কালের প্রতিমা'- ২য়, সং ১৯৯১, পৃ: ২৯৫

৪. ড. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, তদেব, পৃ: ২৯৪

৫. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসে কালান্তর, দেজ সং—১৯৮৮, পৃ: ৪১২